সীমান্ত গান্ধী

[খাঁ আবদুল গফুর খান]

আগস্ট-সংগ্রাম ও মেদিনীপুরে জাতীয় সরকার,
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস,
আজাদ্ হিন্দ ফৌজ দিবসে কলিকাতায়
গুলীবর্ষণ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীসুকুমার রায়

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ : ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

কলিকাতা, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
কর্তৃক প্রকাশিত ও ১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড হইতে শ্রীধনঞ্জয়
প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

গফুর খানের জীবনী এখন পর্যন্ত রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থখানি লিখিবার সময় আমাকে নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ সম্পর্কে লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইয়াছে। কিন্তু জীবনীর যোগসূত্র রক্ষা করিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া পুরাতন ও নূতন সংবাদপত্রের ফাইল ঘাঁটিতে হইয়াছে। পুস্তকখানি লিখিবার সময় বন্ধু শ্রীযুত সত্যেন সেনের নিকট হইতে আমি যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়াছি। লেখার ব্যাপারে তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য না করিলে হয়ত বইখানি অর্ধেক লেখা হইয়াই পড়িয়া থাকিত।

সীমান্ত গান্ধী ও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলন সম্পর্কে জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। ১৯৩০ এবং ১৯৪২ সালের আন্দোলনে পাঠানজাতি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে—শান্তি-পূর্ণভাবে স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মবলি দিয়া যে অহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহাই সীমান্ত আন্দোলন সম্পর্কে জানিবার জন্য দেশবাসীর আগ্রহ জাগাইয়া তুলিয়াছে। তবে গফুর খানের আন্দোলনকে বুঝিতে হইলে আগে মানুষটিকে চিনিতে হইবে। তাই সর্বপ্রথম সেই চেষ্টাই করিয়াছি। ইতি

মহালয়া
১৩৫৩

গ্রন্থকার

প্রকাশকের কথা

সীমান্ত গান্ধীর বয়স এখন ৮৩ বৎসর। জ্ঞানের জ্যোতিতে উজ্জ্বল তাঁহার মুখমণ্ডল। গাম্ভীর্য ও প্রশান্তভাবমণ্ডিত তাঁহার চরিত্র। মুখে সর্বদা হাসি লাগিয়াই আছে। ভারতের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই দীর্ঘতম ব্যক্তি। খাঁটি হিন্দুস্থানীতে তিনি কথা বলেন। অবশ্য কথা বলেন অতি অল্পই। তিনি বাণী অথবা বক্তৃতা দেওয়া পছন্দ করেন না। সীমান্ত গান্ধী কর্মে বিশ্বাসী এবং দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করিতেই তিনি ভালবাসেন। তিনি বলেন, "আমি খোদার সেবকমাত্র। আমি খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার। এই দেশের যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গ্রামের মানুষ আছে, তাহাদের মধ্যে গিয়া কাজ করাতেই আমি বিশ্বাস করি।"

২২ বৎসর বয়সে খাঁ আবদুল গফুর খান সক্রিয়ভাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি তিনি ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীনভাবে দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন। সুদীর্ঘ কারালাঞ্ছনা ও নির্যাতনে নিপীড়িত, আত্মত্যাগে সুমহান্, স্বাধীনতা-সাধনার এই বীর পুরোহিতকে সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণ ও প্রতিকূল অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত এক মুহূর্তের জন্যও নিরুদ্যম বা নির্বীর্য করিতে পারে নাই। তাঁহার 'সেবার মহৎ ব্রত' ভঙ্গ করিতে পারে নাই।

গফুর খান কখনও ধর্মকে কর্ম হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই। ধর্মে একান্ত বিশ্বাস হইতেই তিনি কর্মের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তিনি খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার। খোদার সেবা অর্থাৎ মানবসেবাই তাঁহার ধর্ম। অহিংসা ও মানবসেবাকে

তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের তিনি অহিংসা ও সেবার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা, অহিংসার প্রতি তাঁহার আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে স্বতস্ফূর্ত। তাঁহার অহিংসার আদর্শের জন্য তাঁহাকে কাহারও নিকট ঋণী মনে করিলে মস্ত ভুল করা হইবে। উইলিয়াম বার্টন তাঁহার 'নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার' গ্রন্থে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য—"Ghaffar Khan is in complete accord with the principle of non-violence, but has not borrowed his outlook from Mahatma Gandhi. He has reached it and reached it independently."

"অহিংসার আদর্শের সহিত গফুর খানের সম্পূর্ণ মিল আছে। কিন্তু তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গী মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে ধার-করা নয়। তিনি তাঁহার নিজের চেষ্টাতেই ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন। "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" গফুর খান ইহার উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"My non-violence has almost become a matter of faith with me. I believed in Mahatma Gandhi's Ahimsa before. But the unparalleled success of the experiment in my province has made me a confirmed champion of non-violence. God willing, I hope never to see my province take to violence. We know only too well the bitter results of violence from the blood-feuds which spoil our

fair name. We have an abundance of violence in our nature. It is good in our own interests to take a training in non-violence. Moreover, is not the Pathan amenable only to love and reason? He will go with you to hell if you can win his heart, but you cannot force him even to go to heaven."

"আমার অহিংসা আমার নিকট প্রায় ধর্ম্মবিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। আমি মহাত্মা গান্ধীর অহিংসায় পূর্ব্বেই বিশ্বাস করিতাম। আমার প্রদেশে ইহার অতুলনীয় সাফল্য অহিংসার উপর আমার বিশ্বাসের ভিত্তি আরও দৃঢ় করিয়াছে। ভগবান যদি ইচ্ছা করেন, আমি আশা করি যে, আমার প্রদেশকে আর হিংসা গ্রহণ করিতে দেখিব না। রক্তপিপাসু ঝগড়া-বিবাদ —যাহা আমাদের সুনাম কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহা হইতেই হিংসার পরিণতি যে কি ভীষণ তাহা আমরা ভালরূপেই বুঝিয়াছি। আমাদের প্রকৃতিতে প্রভূত পরিমাণে হিংসার ভাব রহিয়াছে। আমাদের স্বার্থের খাতিরেই আমাদের অহিংসার অনুশীলন করা উচিত। তাহা ছাড়া পাঠানরা কি একমাত্র প্রেম ও যুক্তিরই অধীন নহে? তুমি যদি তাহার চিত্ত জয় করিতে পার, সে তোমার সহিত নরকে যাইতেও প্রস্তুত আছে, কিন্তু জোরজবরদস্তি করিয়া তুমি তাহাকে স্বর্গেও লইয়া যাইতে পারিবে না।"

প্রেমের দ্বারাই গফুর খান পাঠানদের হৃদয় জয় করিয়াছেন। একটি দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধপরায়ণ জাতি অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিল—একথা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

গফুর খানের আজীবন ত্যাগস্বীকার ও কঠোর তপস্যাই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের উক্তিই খাঁটি ধারণা জন্মাইতে পারে। মহম্মদ ইউনুস্-এর গ্রন্থের প্রস্তাবনা লিখিতে গিয়া গফুর খান সম্বন্ধে তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—"When the history of the present day comes to be written, only very few of those who occupy public attention now, will perhaps find mention in it. But among those very few there will be the outstanding commanding figure of Badshah Khan. Straight and simple, faithful and true, with a finely chiselled face that compells attention, and a character, built up in the fire of long suffering and painful ordeal, full of the hardness of the man of faith believing in his mission, and yet soft with the gentleness on one who loves his kind exceedingly."

"বর্তমান কালের ইতিহাস যখন রচিত হইবে তখন জনপ্রিয় নেতাদের অতি অল্পসংখ্যক মাত্র সেই ইতিহাসে স্থান পাইবেন। কিন্তু সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে বাদশা খানের অনন্যসাধারণ ও প্রতিপত্তিশালী জীবনী স্থানলাভ করিবে। তিনি সোজা ও সরল, বিশ্বাসী ও সত্যনিষ্ঠ এবং সুন্দরভাবে খোদাই-করা তাঁহার মুখমণ্ডল স্বভাবতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুদীর্ঘ নির্যাতন ও শোকাবহ কঠোর পরীক্ষায় তাঁহার চরিত্র অগ্নিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে। কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসে তিনি

কঠোর, কিন্তু মানুষকে যাঁহারা একান্তভাবে ভালবাসেন, তাঁহার চরিত্র তাঁহাদের ন্যায়ই নম্র ও বিনয়ী। যখন তিনি স্বদেশ-বাসিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন তখন দেখা যায়, কিরূপ স্নেহ ও প্রশংসার ভাব লইয়া তাহারা গফুর খানের প্রতি চাহিয়া আছে। তিনি পুশ্‌তো ভাষায় তাহাদের সহিত কথা বলেন। তাহাদের দোষত্রুটির জন্য যদিও তিনি বারবার তাহাদের ভর্ৎসনা করেন কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বরে সর্বদাই নম্রতা, বিনয় এবং কোমলতার পরিচয় পাওয়া যায়।”

মহামতি সি. এফ. এণ্ডরুজ গফুর খানের অন্তরের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। একদিক দিয়া উভয়ের মধ্যে একটা খাঁটি মিল ছিল। উভয়েই দীনবন্ধু। মহামতি এণ্ডরুজ তাঁহার ‘নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার’ গ্রন্থের নানা স্থানে বাদশা খানের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিও গফুর খান ও তাঁহার আন্দোলন সম্পর্কে ইংরেজদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। তিনি গফুর খান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন খাঁটি বিশ্বাস লইয়াই বলিয়াছেন। বেশ জোরের সহিত তিনি একথা বলিয়াছেন,—“Khan Abdul Gaffar Khan I can speak with real confidence. He is transparently sincere, with the simple directness of a child, and he is above all a firm believer in God. He won my heart both by his gentleness and truth. His fearlessness, also, made me feel his moral greatness.”

“খাঁ আবদুল গফুর খান সম্বন্ধে আমি খাঁটি বিশ্বাস লইয়া

বলিতে পারি। তাঁহার আন্তরিকতার মধ্যে কোন আবিলতা নাই। তিনি শিশুর ন্যায় সরল এবং সর্বোপরি তিনি ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসী। সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ও নম্র ব্যবহার দ্বারা তিনি আমার হৃদয় জয় করিয়াছেন। তাঁহার নির্ভীকতার মধ্যে আমি তাঁহার নৈতিক মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছি।”

গফুর খানের আসন ঠিক কোথায় একমাত্র ইতিহাসই তাহার প্রমাণ দিতে পারে; কিন্তু তবুও একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মানুষ হিসাবে তাঁহার মহত্ত্ব কোন দিন মলিন হইবে না। যতই দিন যাইতে থাকিবে, তাঁহার মহত্ত্ব ততই ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। ইতি—

প্রকাশক

সূচীপত্র

সূচনা

খাঁ আবদুল গফুর খান ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে পেশোয়ার জেলায় সোয়াত নদীর তীরবর্তী উটামানজাই গ্রামের এক খ্যাতিসম্পন্ন জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বৈরাম খান। খান-পরিবার মহম্মদজাই উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া বিলাসের আতিশয্যে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সম্ভোগে গফুর খানের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। সে সময় সীমান্ত প্রদেশে জীবনযাপন-প্রণালী বিশেষ নিরাপদ ছিল না। পাঠানজাতি নানা উপজাতিতে বিভক্ত। আফ্রিদি, মমন্দ, ওয়াজির, মাসুদ, বাজাউরী, মহম্মদজাই, সিনওয়ারী, ওরাকজাই, ভিট্টানিস প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে কোনই সম্প্রীতির বন্ধন ছিল না। ছোট-বড় জায়গিরদারদের মধ্যে অহরহ বিবাদ-বিসম্বাদ বাধিয়াই থাকিত। বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যেও কোন সদ্ভাব ছিল না। এমন কি পাশাপাশি পাঠান পরিবারগুলিও সদা-সর্বদা গৃহবিবাদে লিপ্ত থাকিত। এইরূপ পারিপার্শ্বিকতাই পাঠানদের একটা সদা-যুদ্ধপরায়ণ, মৃত্যুভয়হীন, দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক জাতিতে পরিণত করিয়াছে। তাহাদের দেহের গঠন পর্বতের ন্যায় কঠিন, তাহাদের চিত্ত ঝটিকাসঙ্কুল পার্বত্য নদের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল। এইরূপ একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ দুর্ধর্ষ জাতিকে অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করা সম্ভব, এ কল্পনাও কেহ কোনদিন মনে স্থান দেয় নাই। কিন্তু খাঁ আবদুল গফুর খান কোন্ অমোঘ মন্ত্রবলে যে এই অসম্ভবকে

বাস্তবে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। স্বদেশবাসীর শিক্ষা, রাজনৈতিক ও সমাজ-জীবন সংগঠনকল্পে তিনি যে শ্রম ও ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন, মানব-ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। গফুর খানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ খান সাহেব ও তাঁহাদের পিতা বৈরাম খানও পুত্রের সহিত একই উদ্দেশ্য-সাধনে উদ্বোধিত হইয়া স্বদেশের সেবাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের জীবনও দেশের জন্য অকুণ্ঠ ত্যাগস্বীকার, নিষ্পেষণভোগ ও কারাবরণের জীবন। পাঠানদের মধ্যে জাতীয় ও রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধনের মূলে এই খান-পরিবারের দান ঠিক কতখানি, ইতিহাস তাহা নির্ণয় করিবে। তবে একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খান-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচেষ্টার ফলেই আজ পাঠানজাতি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যের সহিত সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে।

আবদুল গফুর খান যে সময় জন্মগ্রহণ করেন তখন পৃথিবীর বুকে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় যেমন একদিকে ধনতন্ত্রবাদ চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে ব্রিটেন ক্রমে গণতন্ত্রের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে কিন্তু সাম্রাজ্য-লিপ্সা ও তজ্জনিত বৈরীভাব পুরাপুরিই বজায় ছিল।

এদিকে ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের মধ্যে সেই সময় হইতে সীমানির্দেশের কার্য সুরু হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় তখনও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধ ও ভারতের উপর তাহার

প্রতিক্রিয়ার কথা ভুলিতে পারে নাই। কাজেই তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এই সীমা-নির্দেশের ব্যাপারে আর একটি যুদ্ধের আশঙ্কা দেখিতে পাইলেন। সৈন্যব্যয় সম্পর্কে দীন্‌শা এডুলচী হিসাব করিয়া দেখান যে, ১৮৬৩ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সৈন্যব্যয় মাত্র ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়; আর ১৮৮৫-৮৬—১৮৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আর এই অর্থ ব্যয় করা হয় শুধু রুশিয়ার আক্রমণ-প্রতিরোধ করিবার জন্য। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সামরিক দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সুতরাং সীমান্ত রক্ষার অজুহাতে ভারতীয়দের ব্যয়ে বিরাট বিদেশী সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখা হয়। তাই সেই সময় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে বালগঙ্গাধর তিলক এই মর্মে এক প্রস্তাব করেন যে, ভাবী আক্রমণের আশঙ্কায় জলের মত অর্থব্যয় না করিয়া, ভারতবাসীরা যাহাতে সত্য সত্যই আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারে সেজন্য অস্ত্র-আইনের কঠোরতা দূর করিয়া সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় হইতে স্বেচ্ছাসৈন্য লইয়া রক্ষীবাহিনী গঠন করা হউক। কিন্তু নেতৃবৃন্দের সে আবেদন ব্যর্থ হয়। ভারতের অভ্যন্তরে গণজাগরণের সূচনা এবং ভারতের বাহিরে যখন ইউরোপে সাম্রাজ্য লইয়া বিরোধী স্বার্থের হানাহানি চলিতেছে, সেই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক নিভৃত পল্লীতে এই ঋষিকল্প মানবের জন্ম হয়।

বাল্য ও শিক্ষা

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি বাল্যকাল হইতেই গফুর খানের বিশেষ আগ্রহ ছিল। অতি অল্প বয়সেই তাঁহাকে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর তিনি 'চার্চ অব ইংলণ্ড মিশন' স্কুলে ভর্তি হন। তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ খান সাহেবও পেশোয়ারে এই মিশন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে গফুর খান পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের প্রভূত সুযোগ পান। এই স্থানে তিনি উইগ্রাম নামে একজন ধার্মিক মিশনারীর সংস্পর্শে আসেন। মিশন স্কুলের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ই এফ্ ই উইগ্রাম উদারনৈতিক মতবাদ ও স্বাধীন চিন্তার পরিপোষক ছিলেন। উইগ্রামের শিক্ষা গফুর খানকে এই দুইটি গুণেরই অধিকারী করিয়াছে। গফুর খান ভবিষ্যৎ জীবনে বহুবার এই শিক্ষাগুরুর নিকট তাঁহার ঋণের কথা শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করিয়াছেন। ইংরাজ-চরিত্রের বিবিধ গুণাবলীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃই তিনি ভবিষ্যতে একে একে তাঁহার পুত্রদের শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন।

উচ্চশিক্ষাভিলাষে আবদুল গফুর খান যেদিন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালযে প্রবেশ করিলেন, সেদিনটি উটামানজাই পরিবারের পক্ষে একটি বড়ই শুভদিন। সে সময় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। বর্তমানের ন্যায় সে সময় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ও প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষার দ্বন্দ্বভূমি ছিল না। দেশপ্রেম ও জাতীয়তার আদর্শই সেখানে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই তরুণ

গফুর খান সর্বপ্রথম মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সংস্পর্শে আসেন। মৌলানা আজাদ তখনই উর্দু ভাষায় একজন শক্তিশালী লেখকরূপে সমগ্র ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার "আল-হেলাল" সে সময় সে যুগের মনীষী এবং বিশেষ করিয়া মুসলমান যুবকগণের মনকে নাড়া দিয়াছিল। "প্রথমতঃ, আলিগড় দলের গতানুগতিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম; দ্বিতীয়তঃ, মুসলমানদের অন্তর হইতে বৈদেশিক শাসনের প্রতি আনুগত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের" উদ্দেশ্য লইয়াই মৌলানা আজাদ "আল-হেলাল" প্রকাশে উদ্যোগী হন। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিমদের নেতৃবৃন্দ আল-হেলালের তরুণ লেখকের প্রতি নানাপ্রকার কটূক্তি করিতে থাকে। মৌলানা আজাদ কাহারও বিরুদ্ধাচরণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এবং বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়ে ভীত না হইয়া স্বাধীনভাবে একাকী মুক্তির পতাকা হস্তে 'আল-হেলাল' প্রচার করেন। স্বাধীন চিন্তা, নির্ভীক মনোভাব, সংস্কার ও বিপ্লব—ইহাই হইল তাঁহার পাথেয়। গফুর খান তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার পর উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। মৌলানা আজাদের জাতীয়তা, তাঁহার স্বাধীন চিন্তাধারা ও প্রগতিমূলক রচনাবলী গফুর খানের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গফুর খান প্রবল আত্মবিশ্বাস ও একটা উদার আদর্শবাদ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, উন্নত মস্তক ও তেজদীপ্তিময় ব্যক্তিত্বের একটা অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহা মন্ত্রের ন্যায় চেতনাকে মুগ্ধ করে। সে সময় তিনি দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি ও ওজনে ২ মণ ১৫ সের ছিলেন।

কর্তব্য নির্ধারণ

গফুর খানের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই সৈনিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে গফুর খানের অবচেতন মনে এই গৌরবলাভের একটা প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান ছিল। তিনিও সেনা-বিভাগে যোগদান করিবেন স্থির করেন। যোদ্ধা-জীবন বরণ করা যে-কোন একজন পাঠানের পক্ষেই অতি স্বাভাবিক। সুতরাং তিনি যে সেনা-বিভাগে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। অতঃপর গফুর খান সেনা-বিভাগে কমিশনের জন্য দরখাস্ত করেন। সেনাবিভাগে যোগদান করিবেন স্থির করিবার পর একদিন গফুর খান তাঁহার এক সৈনিক বন্ধুর সহিত সাক্ষাতের জন্য পেশোয়ারে এক সামরিক দপ্তরে গমন করেন। সেস্থানে গিয়া গফুর খান যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে বিদেশীর কর্তৃত্বাধীন সৈনিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে তিনি একজন প্রবীণ ভারতীয় সৈন্যকে জনৈক তরুণ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী কর্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে দেখিলেন। এখানেও সেই সাদায়-কালায় বিভেদ। সেনা-বিভাগে মনুষ্যত্বের অবমাননার এই চিত্র দেখিয়া এক নিমেষে তাঁহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অতঃপর ভারাক্রান্ত মন লইয়া তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঘটনাটি সামান্য কিন্তু ইহার পরিণতি অতি সুদূর-প্রসারী হইল। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি গফুর খানের জীবনে একটি বৃহৎ পরিবর্তনের

সূচনা আনিয়া দিল। অতঃপর গফুর খান সেনা-বিভাগে যোগদানের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া শান্তির সৈনিকরূপে মুক্তির সাধনাকে জীবনে ও কর্মে একান্তভাবে গ্রহণ করিলেন। ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে গফুর খান প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে তিনি ভারতের প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় একেবারে অনাড়ম্বর জীবনযাপনে ব্রতী হইলেন।

দুইবার তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। দুইবারই তিনি সেই পদ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। গফুর খান বলেন যে, এতবড় গৌরবময় পদের দায়িত্ব বহন করিবার মত যোগ্যতা তাঁহার নাই। তিনি একজন খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার। মানবসেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন সামান্য সৈনিকরূপেই জীবন-যাপন করিতে চাহেন।

জনসেবায় আত্মনিয়োগ

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ২২ বৎসর বয়সে খাঁ আবদুল গফুর খান প্রথম স্বদেশের জনসাধারণের মধ্যে গিয়া কাজ আরম্ভ করেন। অশিক্ষার হেয়তা ও সমাজব্যবস্থার গলদ দূর করিয়া পাঠানদের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য গফুর খান তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য লইয়া তিনি "অঞ্জুমান-ই-ইল্লা-ই-আফাগিনা" নাম দিয়া একটি সঙ্ঘ গঠন করেন। কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী তখন পর্যন্ত তাঁহার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। এই প্রচেষ্টায় তাঁহার প্রধান

সহায় হইয়াছিলেন হাজি আবছুল ওয়াহেদ সাহেব। হাজি সাহেব, হাজি তুরাংজাই নামেই জনসমাজে অধিক সুপরিচিত ছিলেন। পেশোয়ার জেলার গদ্দর নামক স্থানে তাঁহাদের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে শীঘ্রই পেশোয়ার ও মর্দান জেলায় বহুসংখ্যক বিদ্যালয় (আজাদ স্কুল) স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহাদের আন্তরিকতায় পাঠানরা বিপুল উদ্দীপনার সহিত সাড়া দেয়।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে গফুর খান হাজি সাহেবের সঙ্গ হারাইলেন। হাজি সাহেব তরুণ গফুরের প্রধান সহায় ছিলেন এবং গফুর খানও সকল ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিতেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রথম হইতেই তাঁহাদের গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখিতেছিলেন। কিভাবে গফুর খানকে হাজি সাহেবের সঙ্গচ্যুত করা যায় সীমান্ত কর্তৃপক্ষ সেই সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। বিচক্ষণ হাজি সাহেব সরকারী কর্তৃপক্ষের অসদুদ্দেশ্য টের পাইয়া উপজাতীয় অঞ্চলে সরিয়া পড়েন। ইহার পর গভর্নমেণ্ট এই সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করেন। হাজি সাহেবের অনুপস্থিতিতে গফুর খানের নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনিও উপজাতীয় অঞ্চলে গিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবেন স্থির করিলেন। তরুণ গফুর খান ইতিমধ্যেই সুবিখ্যাত বিপ্লবী নেতা মৌলানা ওবেতুল্লা সিন্ধী ও সেওবান্দের সেখ-উল-হিন্দ মৌলবী মামুদুল হাসানের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

ওবেতুল্লা সিন্ধী ও মৌলবী হাসান উভয়েই চরম-পন্থী এবং ভারতের মূল সমস্যা সমাধানের পথ সম্পর্কে উগ্রমতাবলম্বী ছিলেন। গফুর খান দেশের বিভিন্ন সমস্যা লইয়া তাঁহাদের সহিত আলোচনা করেন। বয়সে তরুণ হইলেও গফুর খানের বিচক্ষণতায় তাঁহারা বিস্মিত হন। তাঁহাদের প্রগতিমূলক চিন্তাধারা গফুর খানকে অনুপ্রাণিত করে। অতঃপর গফুর খান বহুদিন ধরিয়া মনন্দ ও বাজাউর উপজাতীয় অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন কিন্তু কোন স্থানেই মন স্থির করিতে না পারিয়া উপজাতীয় অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। পেশোয়ারে ফিরিবার পর তিনি পুনরায় লুপ্তপ্রায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনঃসংগঠন ও সম্প্রসারণে দৃঢ়সংকল্প হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

সংকল্প-নিষ্ঠা

গফুর খানের সংস্কারমূলক কর্মপন্থায় সীমান্ত গভর্নমেণ্ট শঙ্কিত হইয়া উঠেন। সীমান্ত গভর্নমেণ্ট গফুর খানকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য তাঁহার পিতা বৈরাম খানকে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় না। গফুর খান দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের সংকল্প লইয়াই কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কোন বাধাই তাঁহাকে কোনদিন সে-সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। কর্মের যে উদ্দাম প্রবাহ তাঁহার অন্তরে অন্তঃসলিলা বেগবান নির্ঝরের মত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাকে রোধ করিবার জন্য বিদেশী শাসকদের সকল ষড়যন্ত্রই সে সময় ব্যর্থ হইয়াছিল।

সীমান্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশের কথা গফুর খানকে জানান হইলে তিনি পিতার নিকট একটিমাত্রই প্রশ্ন উত্থাপন করেন, "আচ্ছা, তাঁহারা যদি আমার দৈনন্দিন প্রার্থনা বন্ধ করিবার জন্য আপনাকে নির্দেশ দিতে বলেন, আপনি কি আমাকে তাহাই করিতে বলিবেন?" পুত্রের কণ্ঠে সংকল্পের আভাস পাইয়া পিতাও সমুচিত উত্তর দেন, "কখনই না।" গফুর খান তখন বলেন যে, দরিদ্রের সেবাই তাঁহার দৈনন্দিন প্রার্থনার বৃহত্তম অংশ। পুত্রের নিষ্ঠা পিতার হৃদয় জয় করে। বৈরাম খান পুত্রকে সংকল্পচ্যুত করিবার ব্যাপারে তাঁহার অক্ষমতা সীমান্ত কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন। পরিশেষে গভর্নমেণ্ট এই তথাকথিত অবাধ্যতার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য গফুর খান, তাঁহার ৯০ বৎসরের পিতা বৈরাম খান ও তাঁহাদের পরিবারের অন্যান্য সকলকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করেন। এই ঘটনা ঘটে ১৯১৯ সালে।

সীমান্তে এক পুত্রের তথাকথিত বে-আইনী কার্যকলাপের জন্য জীর্ণ বৃদ্ধ পিতাকে সপরিবারে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষেপ করা হইল। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট একথা ভাবিয়া দেখিলেন না যে, বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ খানসাহেব কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য রণক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষ লইয়া তাঁহাদেরই পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। ডাঃ খানসাহেবকে তাঁহার পরিবারস্থ সকলকে গ্রেপ্তারের কথা ভারতসরকার ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলেন না। বহুকাল ইউরোপের নানাস্থানে অতিবাহিত করিয়া ১৯২০ সালে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। ডাঃ খানসাহেব সুদীর্ঘ ১১ বৎসর ভারতের বাহিরে ছিলেন। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষের বহু

পরিবর্তন হইয়াছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদে আসমুদ্রহিমাচল ভারতের জনগণের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বিক্ষোভের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের ঝাপ্টায় ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইয়াছে। ডাঃ খানসাহেব ভারতে ফিরিবার পর সমস্তই দেখিলেন, সমস্তই শুনিলেন। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি তাঁহার সকল শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া গেল। ব্রিটিশ-শাসনের অনাচারে তাঁহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

বাদশা খান

১৯১৯ সালেই 'সম্রাটের ঘোষণা'র পর গফুর খান, তাঁহার পিতা ও গফুর খানের পরিবারস্থ অন্যান্য সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুক্তিলাভ করিয়াই গফুর খান আবার শিক্ষায়তন-গুলি পুনর্গঠনে উদ্যোগী হন। ১৯১৯ সালের শেষদিকে গফুর খানের জন্মভূমি উটামানজাই-এ এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় সীমান্ত প্রদেশের প্রধান প্রধান কর্মিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সীমান্তের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই সভায় গফুর খানের প্রতি পাঠান জনসাধারণের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহারা গফুর খানকে "বাদশা খান" (খানদের রাজা) উপাধির দ্বারা সম্মানিত করেন। সমস্ত সীমান্ত প্রদেশে এমন কি সীমান্ত প্রদেশের বাহিরে ভারতের সর্বত্র তিনি আজ এই নামে সুপরিচিত হইয়াছেন।

খিলাফত আন্দোলন

১৯১০ সালের ঘটনাবলী ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। এই সময় তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তিবর্গের, বিশেষ করিয়া ব্রিটিশের কঠোর মনোভাব প্রকটিত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের মুসলমানসমাজে এজন্য ভীষণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। তুরস্কের সুলতান মুসলমান জগতের খলিফা ও পবিত্র তীর্থস্থানসমূহের রক্ষক। তাঁহার রাজ্যচ্যুতি ঘটিলে বা তুর্কী-সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইলে মুসলমান সমাজের ধর্মহানির বিশেষ আশঙ্কা। বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডের নিকট ও বিলাতে ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড্ জর্জের নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় না। ইহার প্রতিবাদের জন্য মহাত্মা গান্ধী মুসলমান নেতৃবৃন্দকে সম্পূর্ণরূপে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দেন ও তাঁহাদের নিকট অহিংসা অসহযোগের প্রস্তাব করেন।

বস্তুতঃ যখন সেভার্স্ সন্ধির শর্ত (১৪ মে, ১৯২০), প্রকাশিত হইল, তখন মিত্রশক্তি তথা ব্রিটেনের মনোভাব বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না। কনস্টাণ্টিনোপলে তুর্কী-সুলতান মিত্রশক্তিবর্গের নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। তুরস্কের ইউরোপ-স্থিত অংশ একটি কমিশনের শাসনাধীন হইল, তুর্কী-সাম্রাজ্য আরব, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, ইরান ব্রিটিশ ও ফরাসীরা ম্যাণ্ডেটের আবরণে নিজ নিজ সুবিধামত আয়ত্ত করিয়া লইল। মিশর ও আফগানিস্থানেও ব্রিটিশ প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করা

হইল। মুসলমান রাজ্যসমূহের উপর এই অবিচারে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ-বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিল। ২৮ মে তারিখে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত খিলাফত-সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহার পর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। এই আন্দোলনের নামই 'খিলাফত আন্দোলন'। বহু ভারতীয় মুসলমান তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহের প্রতি ব্রিটেনের ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে স্বদেশ ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুলোক পেশোয়ার ও সীমান্তের অন্যান্য স্থানে আসিয়া সমবেত হয় এবং আফগানিস্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। 'বাদশা-খান' ও তাঁহার সহকর্মীরাও এই 'হিজরাত আন্দোলনে' যোগদান করেন। কাবুলে উপস্থিত হইয়া গফুর খান তথায় বিজয়ী আমানুল্লা খানের সাক্ষাৎ লাভ করেন। গফুর খান, আমানুল্লা খান ও তাঁহার পরিচরবর্গের সহিত সমস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যা লইয়াও তাঁহাদের মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনায় গফুর খান বুঝিতে পারেন যে, এইভাবে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া আশ্রয় গ্রহণে কোন ফল হইবে না। ইহা স্থির করিবার পর তিনি সীমান্ত-প্রদেশে ফিরিয়া আসেন এবং পুনরায় মমন্দদের বসতি অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্যের সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে গফুর খান গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর তিনি স্থির করেন যে, যে-সমস্ত স্থানে তিনি প্রকাশ্যভাবে কাজ করিতে না পারিবেন সে-সকল

স্থানে তিনি আর কাজ করিবেন না। সেই সময় হইতে গফুর খান গুপ্ত-আন্দোলন পরিচালন বা গুপ্ত-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চিন্তা মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলেন। তাঁহার পরবর্তী জীবনে তাঁহার সমস্ত আন্দোলনই প্রকাশ্য-আন্দোলন। গুপ্ত-আন্দোলনের নিষ্ফলতার কথা চিন্তা করিয়া গফুর খান পুনঃপুনঃ একথা বলিয়াছেন,—"ব্রিটিশ জানে যে, এখানে তাহাদের উপস্থিতি আমরা চাই না। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হওয়া উচিত। আমাদের যাহা করণীয় তাহা প্রকাশ্যভাবেই করা উচিত। যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া কোন বৃহৎ কাজ করা যায় না। অবশ্য একথাও আমি ভালরূপে জানি যে, যেটুকু কাজ আমরা করি তাহা আমাদের অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। কারণ গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় সর্বদাই আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। তাই আমাদের যে সংগ্রাম তাহাতে ভীরুর স্থান নাই।" (Frontier speaks)

কোন্ শক্তি বড় ?

গফুর খান পাঠানদের সামাজিক জীবনে নানাপ্রকার গলদ অনুসন্ধান ও তাহা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতে থাকেন। পাঠানদের ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন এবং শান্তিপ্রিয় জাতিতে পরিণত করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বহুলপ্রচারের আবশ্যকতা যে কতখানি গফুর খান তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন। গৃহবিবাদে অযথা শক্তিক্ষয় না করিয়া তাহারা যাহাতে নিজেদের কল্যাণ-চিন্তায়

আত্মনিয়োগ করিতে পারে পাঠানদের তদনুরূপ শিক্ষা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই ছিল গফুর খানের সমগ্র প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য। বিচ্ছিন্ন ও দুর্ধর্ষ পাঠানদের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও আজীবন ত্যাগ-স্বীকারের দৃষ্টান্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বহুকাল ধরিয়া ক্রমান্বয়ে সামরিক শক্তির প্রয়োগে যাহা সম্ভব করিতে পারেন নাই, কোন্ শক্তিবলে গফুর খান তাহা সিদ্ধ করিলেন! পৃথিবীর ইতিহাস তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও এই তথাকথিত সভ্যতার যুগে এইরূপ একটি যুদ্ধপরায়ণ দুর্ধর্ষ জাতির সন্ধান মিলে না। এইরূপ একটি দুর্ধর্ষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ জাতি যে শক্তির নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে সেই শক্তি যে সামরিক শক্তি অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী এ সত্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই শক্তি যে সামরিক শক্তি অপেক্ষা বৃহত্তর এবং শত্রু বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অধিকতর ফলপ্রসূ, পাঠানদের দৃষ্টান্তে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই শক্তি সামরিক শক্তির ন্যায় মানবহৃদয় বিক্ষুব্ধ বা উন্মত্ত করে না, সংযত ও মুগ্ধ করে। এই শক্তি আজ প্রত্যূষকালীন সূর্যের ন্যায় পূর্বাকাশে উদিত হইয়া কিরণরশ্মিজালে ভারতের জনমন উদ্ভাসিত, তরঙ্গায়িত ও মথিত করিয়াছে। সামরিক শক্তি বা প্রতিক্রিয়াশীল পশুশক্তি একদিন এই শক্তির তুলনায় সূর্যের পার্শ্বে নক্ষত্রের ন্যায় মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। এই শক্তির নিকট সমগ্র জগৎকে একদিন নতি স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ এই শক্তির পশ্চাতে যে আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণ, কারানিষ্পেষণভোগ ও অনশন, দুঃসহ নিপীড়ন ও

নির্যাতন, অসহ অপমান ও লাঞ্ছনা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে মানবতা সেই পুঞ্জীভূত গ্লানিকে কখনই অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া একদিন মানব-চেতনার মূলে সবলে আঘাত হানিবেই।

অঞ্জুমান-ই-ইল্লা-ই-আফাগিনার পুনঃসংগঠন

গফুর খান আফগানিস্থান হইতে ফিরিবার পর পুনরায় কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের সহযোগিতায় সীমান্তের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহার 'অঞ্জুমান-ই-ইল্লা-ই-আফাগিনা'র পুনঃসংগঠনে মন দেন। এই প্রতিষ্ঠানটি অচিরে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হয়। অঞ্জুমান-ই-ইল্লা-ই আফাগিনার প্রতিষ্ঠালাভের সাথে সাথে তাঁহার কর্মক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। শুধু কৃষির দ্বারা জীবিকানির্বাহ ছাড়াও পাঠানেরা যাহাতে জীবনধারণের উপযোগী অন্যান্য উপায়সমূহ আয়ত্ত করিতে পারে, সেদিক দিয়াও তিনি তাহাদের উৎসাহিত করেন। গফুর খান নিজেই উটামানজাইএ একটি দোকান খুলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর সম্মুখে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। শান্তিপূর্ণভাবে জীবিকা অর্জন করিয়া পাঠানেরা যাহাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়া কিছুটা স্বাধীন হইতে পারে গফুর খান সেই চেষ্টা করেন। অর্থনৈতিক কারণই সীমান্তে অশান্তির প্রধান কারণ। সুতরাং কেবল কৃষির উপর নির্ভর না করিয়া জীবিকা অর্জনের অন্যান্য উপায়গুলির প্রতিও গফুর খান তাহাদের আকৃষ্ট করেন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়া

পাঠানেরা যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে সেইভাবে তাহাদের সংগঠিত করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার সমগ্র প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য। যে-কোন সভ্যজাতি খাঁ আবদুল গফুর খানের এই প্রচেষ্টায় বাধাস্বরূপ না হইয়া প্রেরণাই জোগাইবে—একটি সভ্য জাতির পক্ষে অপর একটি সভ্য ও উন্নত জাতির নিকট হইতে সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু কর্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া গফুর খান সরকারী কর্তৃপক্ষের রোষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। সীমান্ত-প্রদেশের তদানীন্তন চীফ্ কমিশনার স্যার জন ম্যাফি গফুর খানকে তাঁহার সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ ভঙ্গ করিলে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানেরও হুমকি দেখাইলেন। এই আদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গফুর খান আপন কর্তব্য করিয়া চলিলেন। পরিশেষে গভর্নমেণ্টের নির্দেশভঙ্গের অজুহাতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার ও ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

বন্দী-জীবনের অভিজ্ঞতা

বিগত ২৫ বৎসরে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীদের বিবিধ উপায়ে দুর্বল করিয়া রাখিবার চেষ্টাও পদে পদে ব্যাহত হইয়াছে। কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আচরণের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে বন্দীদের উপর জুলুম কিছুটা কমিয়াছে। কিন্তু তখনকার দিনে কারাগারে রাজ-বন্দীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। রাজ-

বন্দীদের প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করা হইত। গফুর খান একজন রাজবন্দী; সুতরাং তাঁহার প্রতি শত্রুর ন্যায়ই নির্দয় ব্যবহার করা হইত। একবার গফুর খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল গনি খান মিয়ানওয়ালি জেলে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সেখানে পিতাকে তিনি যে অবস্থায় দেখিতে পান তাহাতে দুঃখে ও ক্ষোভে তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসে। গফুর খানের পরিধানে হাফ্-শার্ট, খাট পায়জামা, পায়ে কাঠের পাদুকা, হাতে ও পায়ে বেড়ী এবং গলায় একটি ভারী লোহার হাসুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুস্তো ভাষায় লিখিত 'পুকতুন' নামে গফুর খান যে পত্রিকা পরিচালনা করেন, তাহাতে তাঁহার বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি ধারাবাহিকভাবে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি একদিকে যেমন শোকাবহ তেমনি অন্যদিকে রাজবন্দীদের প্রতি জেল-কর্তৃপক্ষদের নির্দয় আচরণের সাক্ষ্য প্রদান করে। "বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও কারাজীবনের অভিজ্ঞতা" এই শিরোনামায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইত। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি ভারতের বিভিন্ন কারাগারের বন্দীদের অবস্থা ও তাঁহার সুদীর্ঘ কারাজীবনের অভিজ্ঞতা ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বন্দীজীবনে গফুর খানকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। তাঁহাকে দিয়া প্রত্যহ ১৫ সের হইতে ২০ সের পর্যন্ত ডাল ভাঙ্গান হইত। এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করার ফলে তাঁহার কটিদেশে বাত ধরিয়া যায় এবং এখন পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন নাই। একবার তাঁহার জন্য একজোড়া লোহার বেড়ী আনিলে পরাইবার সময় দেখা গেল যে,

সেগুলি তাঁহার পায়ে অত্যন্ত ছোট হয়। কিন্তু জেল-কর্তৃপক্ষের নির্দেশ,—সেই বেড়ী-জোড়াই তাঁহাকে পরিতে হইবে। বেড়ী পরাইবার সময় তাঁহার পায়ের গাঁইট জখম হইয়া দর্‌দর্‌ করিয়া রক্ত ঝরিতে থাকে। যেন কিছুই হয় নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া নির্দয় জেল-সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট বলেন—"ও কিছুই নয়, ক্রমেই এসব সয়ে যাবে।" গফুর খানের বিবরণ হইতে আরও জানা যায়, কিভাবে তিনি জেল-কর্তৃপক্ষদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিতেন! গফুর খান কাহারও নিকট কোনদিন অনুগ্রহ-প্রার্থী হন নাই।

ফকির-ই-আফগান

১৯২৪ সালে গফুর খান মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার কারামুক্তির কিছুদিন পরেই উটামানজাই গ্রামে এক বিরাট সভা আহূত হয়। সীমান্ত-প্রদেশের বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট কর্মিগণ ও হাজার হাজার পাঠান বিপুল উদ্দীপনার সহিত এই সভায় যোগদান করে। এই সভায় ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় এবং গণ-সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সভায় সমবেত বিপুল জনতা গফুর খানের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে "ফকির-ই-আফগান" বা 'আফগান গৌরব' সম্মানে ভূষিত করে। এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় কি গভীরভাবে গফুর খান সীমান্তবাসীদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রতি গফুর খানের দরদ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, ঠিক সেই অনুপাতেই গফুর খানের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাও স্বতঃস্ফূর্ত।

মক্কা-সম্মেলন

১৯২৬ সালে হজের সময় আরবের সুলতান ইবন সাউদ মক্কায় মুসলমানদের এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান সমাজের উপযোগী কোন কর্মপ্রণালীর ভিত্তিতে পৃথিবীর মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্যই এই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল। গফুর খানও সেই সময় এই সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য মক্কায় গমন করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সহিত নানা সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়। ভারতীয় মুসলমান প্রতিনিধি-গণের অদ্ভুত মনোবৃত্তির ফলে অবশ্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত পণ্ড হইয়া যায়।

হজ-যাত্রা-শেষে গফুর খান ইরাক, ইরান, প্যালেস্টাইন ও আরবের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সেই সকল মুসলমান রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনায় অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান লাভ করেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্তায় তিনি বুঝিতে পারেন যে, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নের সহিত আজ পৃথিবীর অর্ধেক লোকের স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত। এই সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ভারতের স্বাধীনতার উপর অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য

বজায় রাখিবার জন্য ব্রিটেনকে সেই সঙ্গে আরও বহু রাষ্ট্রকে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে। ব্রিটেন তাহার সাম্রাজ্য-বিস্তার ও সম্পদ-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অগণিত রাষ্ট্রকে তাহার করতলগত করিয়া রাখিবার জন্য ভারতের সহায়-সম্পদ্, ভারতের লোকবল ও ঐশ্বর্যবল নিয়োগ করিয়াছে। ভারতের সহায়-সম্পদ্ কেবলমাত্র বিগত মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ও সম্প্রতি যে মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে সেই দুই মহাযুদ্ধেই নিয়োজিত হইয়াছে এরূপ নহে;—পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা, চীন ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থানেও ব্রিটেনের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বহুবার ভারতের লোকবল ও ঐশ্বর্যবল নিয়োজিত হইয়াছে। তাহা ছাড়াও আফগানিস্থান, আরব, ইরান, ইরাক ও তুরস্কের বিরুদ্ধেও ব্রিটেনের স্বার্থের খাতিরে ভারতীয়দের যুদ্ধে লিপ্ত করা হইয়াছে।

ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গফুর খানের কর্মপ্রচেষ্টা প্রধানতঃ ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সমস্ত উপস্বাধীন (Semi-independent) মুসলমান রাষ্ট্র-সমূহে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁহার দৃষ্টিপথ প্রসারিত করে। তিনি বুঝিতে পারেন যে, পৃথিবীর সমগ্র মুসলমানদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে একটা জাতীয়তার ভাব দেখা দিতেছে। সে সময় তুরস্কের খিলাফত কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে; এবং আতাতুর্কের নেতৃত্বে সেস্থানে শক্তিশালী প্রজাতন্ত্র-শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইরান ও আরব শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী নেতা রেজাশাহ ও ইবন সাউদের হাতে আসিয়াছে। এদিকে জগলুল

পাশার নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে "মিশরীয় দল" নামে একটি সর্বদলীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই মিশরীয় দলে সকল সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া গফুর খান বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সমগ্র হিন্দুস্থানের স্বার্থের জন্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আবশ্যকতা যে কতখানি তাহা তিনি সবিশেষ উপলব্ধি করেন। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যসাধনে গফুর খানের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা আজ কাহারও নিকট অজ্ঞাত নহে। গফুর খান ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক। সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া হানাহানি ও রেষারেষি চলিলেও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সমস্তই সাময়িক, এবং তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন সেই পথেই একদিন মুসলমান সমাজের কল্যাণ আসিবে, সমগ্র হিন্দুস্থানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হইবে।

পুক্‌তুন্‌ জির্‌গা

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে খাঁ আবদুল গফুর খান তাঁহার সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিয়া এক নূতন কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে "পুক্‌তুন্‌ জির্‌গা" (আফগান যুব-সঙ্ঘ) নাম দিয়া একটি সঙ্ঘ গঠন করেন। তাঁহার সহকর্মী ও তাঁহার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃতবিদ্য ও উৎসাহী ছাত্রদের লইয়া এই সঙ্ঘ গঠিত হয়। শিক্ষার প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য ছাড়াও তিনি পাঠানদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে চাহেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার নূতন কর্মপ্রণালী জনপ্রিয় করিবার জন্য গফুর খান "পুক্‌তুন্‌" নাম দিয়া পুশতো ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ

প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি পাঠানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিয়া তোলে।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার

এই নূতন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং আন্দোলনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার কর্মপদ্ধতি আরও শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে গফুর খান ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই দলের সহিত "খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার" (খোদার দাস) নাম দিয়া একটি স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘ গঠন করেন।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার দলভুক্ত হওয়ার পূর্বে সদস্যদের নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতে হয়ঃ—

(১) আমি পবিত্র মনে এবং সত্যনিষ্ঠচিত্তে আমার নাম সঙ্ঘ-তালিকাভুক্ত করিতেছি।

(২) মাতৃভূমির জন্য আমি আমার সুখ, ঐশ্বর্য ও জীবন উৎসর্গ করিব।

(৩) আমি দলীয় বিরোধ, ঈর্ষা ও ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিব এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সহায় হইব।

(৪) আমি অন্য কোন দলের সদস্য-তালিকাভুক্ত হইব না এবং বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আমার দল সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলে আরোপিত দোষ-ত্রুটি খণ্ডনার্থে আমি কিছু উচ্চবাচ্য করিতে পারিব না।

(৫) আমি সর্বদা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ মানিয়া চলিব।

(৬) আমি সর্বদা অহিংসার পথ অনুসরণ করিয়া চলিব।

(৭) আমি মানব-সেবায় আত্মনিয়োগ করিব এবং আমার দেশ ও ধর্মের মুক্তিসাধন করাই আমার লক্ষ্য হইবে।

(৮) আমি সদা সৎপথে চলিব এবং সজ্ঞানে কোন অন্যায় করিব না।

(৯) আমি তাঁহার (খোদার) নামে যে কাজ করিব কখনই তাহার জন্য পুরস্কারের প্রত্যাশা করিব না।

(১০) লোকদেখান বা লাভ প্রভৃতি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতি না তাকাইয়া খোদাকে সন্তুষ্ট করাই আমার সকল প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হইবে।

১৯২৯ সালে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার-সঙ্ঘ গঠন ও ১৯৩০ সালে সীমান্ত-প্রদেশে আকস্মিক বিরাট গণ-অভ্যুত্থান এবং পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের প্রসারকে কয়েকশ্রেণীর লোক সন্দেহের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে। তাহারা পাঠানদের এই আন্দোলন সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যাহা ভ্রান্ত তাহা টিকিতে পারে না। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে পাঠানদের বিরাট আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টান্ত ভারতের প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী নরনারীর মনে চির-উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ছাড়াও তাহাদের সংগ্রাম-সঙ্গীত হইতে আমরা তাহাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানিতে পারি।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘের সংগ্রাম-সঙ্গীত

We are the army of God,
Of death and wealth care-free,

We march, our leader and we,
Ready to die.
In the name of God we march
And in His name we die,
We serve in the name of God,
God's Servants are we.
God is our king,
And great is He,
We serve our Lord,
His slaves are we.
Our country's cause,
We serve with our breath,
For such an end,
Glorious is death.
We serve and we love,
Our people and our cause,
Freedom is our aim,
And our lives are its price.
We love our country,
And respect our country,
Zealously protect it,
For the glory of the Lord.
By cannon or gun undismayed,
Soldiers and horsemen,
None can come between
Our work and our duty.

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার গঠনের উদ্দেশ্য

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার-সঙ্ঘ গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাদশা খানের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বাদশা খান বলিয়াছেন—"আমি আমার স্বদেশবাসীর জাতীয় ইতিহাস যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছি। উহা জয়যাত্রা ও বীরত্বের কাহিনীতে পরিপূর্ণ; কিন্তু তাহার মধ্যে কতগুগুলি দোষত্রুটিও আছে। গৃহবিবাদ ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সর্বদাই তাহাদের আত্মত্যাগের মহত্বকে অবনমিত করিয়াছে। তাহাদের অন্তর্নিহিত দোষত্রুটিই তাহাদের অধিকারচ্যুত করিয়াছে, অন্য কোন কারণেই উহা ঘটে নাই। কারণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেহই তাহাদের সমকক্ষ নহে ·········আমি পাঠানদের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া সংগঠন করিতে চাই এবং এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া এমন এক জাতি গঠন করিতে চাই, যে জাতি দেশের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিবে।"—(ফ্রন্টিয়ার স্পীক্‌স্)

এই জাতিগঠন-আন্দোলনের অগ্রদূত— খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার দল—বাদশা খানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় এই জাতি-গঠনের মহান্ ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। মানবসেবা তাহাদের জীবনের ব্রত, খোদার নির্দেশ মানিয়া চলা তাহাদের লক্ষ্য, অহিংসা তাহাদের আদর্শ, মানবতার মুক্তি তাহাদের কাম্য, কর্ম তাহাদের ধর্ম এবং চরখা তাহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের

।

এই নূতন দল ও তাহাদের কর্মপন্থা পাঠানদের মধ্যে সাড়া আনিয়া দেয় এবং সীমান্ত-প্রদেশের সর্বত্র ইহার শাখা-উপশাখা ছড়াইয়া পড়ে। স্বেচ্ছাসেবকগণ সকলেই একধরনের উর্দি পরিধান করিত। তাহাদের উর্দির রং লাল বলিয়া ইংরাজ তাহাদের "রেড্ শার্টস্" বা 'লাল কোর্তা'র দল নামে অভিহিত করিয়াছে। ইহাতে কয়েক শ্রেণীর লোকের মনে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তাহাদের আন্দোলনের মূলে রুশিয়ার 'রেড্স্'দের প্রেরণা আছে এবং তাহারাই এই আন্দোলন পরিচালনের ব্যয়ভার বহন করে। যাহারা এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হয়, তাহাদের চিন্তাশক্তি অতি সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর সর্বত্র আজ যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান-পরিধির সীমা অতিক্রম করিয়া তাহা উপলব্ধি করা তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে। তাহারা কেবল জানে কি করিয়া মানুষকে শোষণ করা যায় এবং তাহাদের স্বার্থ এড়াইয়া চলিতে হয়।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলনের কতকগুলি অভিনব পদ্ধতি আছে যাহা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে খা আবদুল গফুর খান ব্যাখ্যা-মূলক নাটকের অভিনয়-ব্যবস্থা করিয়া দর্শকের সম্মুখে তাঁহার আন্দোলনের তাৎপর্য প্রাণ-বন্ত করিয়া ধরেন। দুর্ধর্ষ পাঠানদের অহিংসার মধ্যে দীক্ষিত করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি পাঠানদের এমন করিয়া গঠন করিতে চাহেন যাহাতে তাহারা নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারে। গফুর খানের এই অভিনব প্রচেষ্টায় বিশেষ ফল দেখা দেয়। এই অভিনয় দেখিবার জন্য বহু দর্শকের সমাগম হইতে থাকে।

অভিনয়শেষে তাহারা হৃদয়ে প্রেরণা ও চোখে-মুখে এক নূতন দীপ্তি লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়।

গফুর খান বহুদিন ধরিয়া সীমান্ত-প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। সীমান্ত-প্রদেশের উত্তরে পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তাঁহার আন্দোলনের নূতন পদ্ধতি জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বহুদিন ধরিয়া ঐ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্নস্থানে কিছু কিছু করিয়া নিঃস্বার্থ কর্মীরও সন্ধান লাভ করেন। এই সকল কর্মীরা স্ব স্ব অঞ্চলে গফুর খানের আদর্শ প্রচারের ব্রত গ্রহণ করে।

প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া দেশবাসীর শিক্ষা ও সমাজ-জীবনে সর্ববিধ কল্যাণ-সাধনে গফুর খান অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। হিংসার পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া তিনি পাঠানদের শ্রম ও প্রেমের পথে পরিচালিত করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশকে তিনি জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯২০ সালের ন্যায় ১৯৩০ হইতে ১৯৩২ সালও ভারতের জাতীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছে। ১৯২৫ সাল হইতেই গফুর খান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনসমূহে ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন এবং সব সময়ই তাঁহার চেষ্টা ছিল—জাতীয় আন্দোলনের সহিত সীমান্ত-আন্দোলনের একটা সামঞ্জস্য বিধান করা। যদিও তিনি অনেক পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন তথাপি বহু পূর্ব হইতেই কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতেই গফুর খান তাঁহার খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার দলকে কংগ্রেসের ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইতে চেষ্টা করেন এবং কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত তাল

রাখিয়া তাঁহার কর্মপদ্ধতিও প্রয়োজনানুসারে অদল-বদল করিয়া লন।

লাহোর অধিবেশন

১৯২৯ সালের কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন সীমান্ত-প্রদেশের আন্দোলনকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করে। সীমান্ত-প্রদেশ হইতে লাহোরের দূরত্ব খুব বেশী নহে। পাঠানদের মধ্য হইতে বহু লোক প্রতিনিধি, দর্শক ও শ্রোতারূপে বাদশা খানের সহিত এই অধিবেশনে যোগদান করে। লাহোর অধিবেশনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নব্যতন্ত্রের নায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সভাপতির অভিভাষণে ভারতবাসীর শক্তি-সামর্থ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি নিজে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী, কিন্তু সে পথে হিংসার স্থান নাই। তাঁহার মতে জাতীয় প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য হইল, "সত্যকার ক্ষমতা অধিকার। আমি মনে করি না—ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মত কোন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমরা সত্যকার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিব। সত্যকার ক্ষমতা যে পাওয়া গিয়াছে তাহার পরীক্ষা হইবে তখনই যখন ভারতস্থিত বিদেশী সৈন্য ও ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিদেশী কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইবে।"

কিন্তু এই বৎসরটি আর একটি কারণেও বিশেষ স্মরণীয় হইয়া আছে। এইবার কংগ্রেসের মূল বিষয় হইল স্বাধীনতা প্রস্তাব। বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে স্বাধীনতা প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। অধিবেশনের কর্মসূচী ও জাতীয় আবহাওয়া পাঠানদের

মন আকৃষ্ট করে এবং স্বদেশের শৃঙ্খল মোচনের জন্য তাহাদের অন্তরে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে।

সীমান্তে সংগ্রামের হোমানল দমনে সরকারী অত্যাচার

১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইলে সীমান্ত-প্রদেশে খাঁ আবদুল গফুর খান তাঁহার খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার বাহিনী লইয়া এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। লবণ আইন অমান্য, বিদেশী বস্ত্র পরিহার, পরিষদ ত্যাগ, কর-বন্ধ আন্দোলন প্রভৃতি এইবারের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অঙ্গীভূত করা হয়। অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার বাহিনী মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনে বদ্ধপরিকর। তাহারা চরম আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত। চরম দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হইয়াও তাহারা পশ্চাদপদ হয় না।

সরকার বিভিন্ন অডিনান্স জারী করিয়া সর্বপ্রকারে আন্দোলন দমনে উদ্যোগী হইলেন। এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসে ভারতের বহু স্থানে উত্তেজিত জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিস ও সৈন্যদল বহুবার গুলীবর্ষণ করে। সরকারী অত্যাচারের বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে ১৯৩০ সালের ২৩শে এপ্রিল পেশোয়ারের রাজপথে সৈন্যদের নির্মম অনাচারের কথা কেহ বিস্মৃত হইবে না। স্বাধীনতার যজ্ঞবেদীতে সংগ্রামের হোমানলে শত শত খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারের গৌরবময় আত্মাহুতির কাহিনী জাতির অন্তরে রক্তাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্ত সত্যাগ্রহীদের উপর সৈন্যদের নির্মম গুলীবর্ষণে পেশোয়ারের রাজপথ রক্তস্নাত

হয়। শত শত পাঠান নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রাণদান করে। এই রক্তস্নানের মধ্য দিয়া পাঠানরা প্রমাণ করে যে, মহাত্মা গান্ধীর শ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহী সৈনিকদের তুলনায় তাহারা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। সীমান্তে গফুর খানের প্রচেষ্টা সার্থক হয়। এই দিনই গাড়োয়ালী সৈন্যদল শান্ত ও নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীচালনা করিতে অস্বীকার করে। তাহার মূল্যস্বরূপ তাহাদের কোর্ট মার্শালের শাস্তি বহন করিতে হয়। সেই সময় হইতে প্রতি বৎসর এই দিনটি সীমান্তের অধিবাসিগণ শহীদ-দিবসরূপে পালন করিয়া আসিতেছে। শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পেশোয়ারে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। ২৩শে এপ্রিল সহস্র সহস্র খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার রক্তবসনে অনাবৃত মস্তকে শোভাযাত্রা সহকারে পেশোয়ারের বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া বাদশা খান ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হন। স্মৃতিস্তম্ভের পার্শ্বে সমবেত হইয়া তাঁহারা শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অতঃপর শোভাযাত্রাটি বাদশা খানের অনুসরণ করিতে করিতে শহরের বাহিরে নির্জন প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হয়। সেখানে গফুর খাঁনের সভাপতিত্বে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারগণ শহীদ্‌দের বীরত্বের কথা স্মরণ করে এবং গফুর খান তাহাদের চরম আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।

সরকারী অনাচারের স্বরূপ

২৩শে এপ্রিল পেশোয়ারে হত্যাকাণ্ডের পরদিনই গফুর খানকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁহার খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার-সঙ্ঘ

বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। সীমান্ত-প্রদেশে রিস্লপুর নামক স্থানে এক অপরিজ্ঞাত সেনানিবাসে ক্রাইম রেগুলেশন্ আইনে গফুর খানের বিচার হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই বিচারের প্রহসন সমাধা হইলে তাঁহাকে গুজরাট সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। 'পুক্তুন্' নামে তিনি যে পত্রিকা পরিচালনা করিতেন গভর্নমেণ্ট তাহার প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। সীমান্ত-প্রদেশের পরবর্তী কিছুকালের ইতিহাস বড়ই দুর্যোগ-ঘন। গুলীবর্ষণ, প্রহার ও অন্যান্য নানা উপায়ে সীমান্তের অধিবাসীদের উপর পুলিস ও সৈন্যদের অত্যাচার অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দেওয়া হয়, তাহাদের পুরনারীর ইজ্জৎ নষ্ট করা হয়। পুলিস ও সৈন্যেরা গ্রামবাসীদের শস্যক্ষেত্র ও মজুত শস্য নষ্ট করিয়া দেয়। গ্রাম আক্রমণ করিয়া সৈন্যরা নানাপ্রকারে গ্রামবাসীদের উপর নির্যাতন ও বহুভাবে তাহাদের লাঞ্ছিত করে। তাহাদের সভা বেপরোয়া গুলীবর্ষণে ভাঙ্গিয়া দেয়; তাহাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনের প্রাণনাশ করে। তাহাদের নিষ্ঠুর আচরণে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। উন্মত্ত সৈন্যরা না আছে এমন অত্যাচার করে নাই। তাহারা গৃহের ছাদ হইতে পর্যন্ত লোকদের নীচে ফেলিয়া দিয়াছে এবং শিশুদের নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছে।

জনৈক আমেরিকান পর্যটক এই অত্যাচারের উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন, "লালকোর্তাদের গুলী করিয়া হত্যা করা সীমান্ত-প্রদেশে ব্রিটিশ সৈন্যদের নিকট তামাসার ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল।" এই দুর্ধর্ষ পাঠানজাতি, যে জাতি প্রতিশোধ না

লইয়া অন্নজল গ্রহণ করিত না সেই জাতি কি করিয়া এইরূপ অহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখাইল ? চরম প্ররোচনামূলক অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও মুহূর্তের জন্য তাহারা অহিংসার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা হারায় নাই। দুর্বার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তাহারা প্ররোচিত হয় নাই। শান্তিপূর্ণভাবে মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের মহান্ ব্রতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

সৈন্য ও পুলিসের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিবরণ

গফুর খানের শিক্ষা ও প্রেরণা ১৯৩০ সালে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলনে অদ্ভুত ইন্দ্রজালের মত কাজ করিয়াছে। অহিংসার প্রতি পাঠানদের আনুগত্য এত প্রবল যে, এমন একটি দৃষ্টান্তও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যে ক্ষেত্রে বলা যায় যে, তাহারা বিন্দুমাত্রও হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। চারসাদ্দা মহকুমার পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ মিঃ জেমিসনের লোমহর্ষণ অত্যাচারের কাহিনী কেহ বিস্মৃত হইবে না। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের উপর এই শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গবের পাশবিক আচরণের তুলনা সভ্যজগতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের নগ্ন করিয়া অতঃপর নির্দয়ভাবে প্রহার করাই ছিল তাঁহার রীতি। তিনি তাহাদের গোচরে তাহাদের প্রিয় নেতা বাদশা খানের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত জঘন্যভাষায় গালি-গালাজ করিতেন। বাদশা খানের উদ্দেশ্যে বর্ষিত অত্যন্ত হীন মন্তব্যসমূহে সায় না দিলে সেই পুলিস কর্মচারীর হাতে তাহাদের আর লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা থাকিত না। কোন সময় তাহাদের ধরিয়া নগ্ন অবস্থাতেই দূষিত ও নোংরা জলাশয়ে পর্যন্ত নিক্ষেপ করা হইত।

নগ্ন অবস্থায় প্রহার

একবার উটামানজাইয়ে ৩ জন খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। অতঃপর তাহাদের উর্দি খুলিয়া ফেলিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। এই বর্বর আচরণে মুহূর্তের জন্য তাহাদের সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং রিভলভার আনিবার উদ্দেশ্যে তাহারা গৃহাভিমুখে ছুটিয়া যায়। এই সময় অকস্মাৎ তাহাদের অধিনায়কের কণ্ঠস্বর তাহাদের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠে—"তোমাদের ধৈর্যের বাঁধ কি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে? মৃত্যু পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকিবে বলিয়া তোমরা যে বাদশা খানের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!" এই কথা শুনিবামাত্র তাহাদের সংবিৎ ফিরিয়া আসেএবং পরক্ষণেই তাহারা অত্যাচারীর সমস্ত নির্যাতন নীরবে সহ্য করে। ইহার পর আক্রমণকারীরা তাহাদের উলঙ্গ করিয়া পদাঘাতে ও বেওনেটের খোঁচায় তাহাদের সমস্ত দেহ রক্তাক্ত করে। তারপর কার্যসিদ্ধির পাশবিক উল্লাসে সেস্থান হইতে চলিয়া যায়।

সভা পণ্ডের চেষ্টা

গফুর খানের গ্রামের বাড়ীতে একদিন একটি সভা হইবে খবর পাইয়া এক পুলিসবাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়। তাহারা প্রথমতঃ ভয় দেখাইয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। সমবেত পাঠানেরা সভা করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। অতঃপর পুলিস তাহাদের উপর গুলীবর্ষণের

অভিপ্রায়ে রাইফেল উদ্যত করে। ঠিক এই সময় সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখে, জনতার মধ্য হইতে একটি বালিকা দৌড়াইয়া উদ্যত রাইফেলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায় এবং চিৎকার করিয়া বলে, "আগে আমাকে হত্যা কর তারপর আমার পশ্চাতে যাহারা আছে তাহাদের হত্যা করিও।" ইহার পর পুলিস সভার কাজে আর বাধা না দিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া যায়।

আর একবার মর্দান জেলার রুস্তমে গফুর খান একদিন এক সভায় বক্তৃতাদানের জন্য উপস্থিত হইলে পুলিস আসিয়া বাধা দেয়। পুলিস সমবেত খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সভা ভাঙ্গিয়া শান্তিপূর্ণভাবে চলিয়া যাইতে বলে, অন্যথায় তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করা হইবে বলিয়া ভয় দেখান হয়। সভাস্থল নিস্তব্ধ। প্রত্যেকটি প্রাণী দৃঢ়সঙ্কল্প। গফুর খান সমস্ত ফলাফলের জন্য প্রস্তুত হইয়া বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আসনে দণ্ডায়মান হন। গফুর খানের সাহস ও সমবেত পাঠানদের দৃঢ়তা দেখিয়া পুলিস কর্তৃপক্ষের উষ্মা কিছুটা দমিত হয়। তাহারা দাঁড়াইয়া দেখে বাদশা খানের বক্তৃতা শুনিবার জন্য পাঠানদের কি অপরিসীম উৎসাহ, কি আগ্রহ!

পদাঘাতে আহত শিশু হত্যা

উৎপীড়নের নানারূপ কলকৌশল উদ্ভাবন করা হয়। কখনও কখনও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সশস্ত্র সৈন্যসারির মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া যাইতে বাধ্য করা হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর সৈন্যদের নির্দয় পদাঘাত, গুলী ও বেওনেটের খোঁচা

চলিত। মিঃ আইস মঙ্গার-এর জঘন্য আচরণ ভুলিয়া যাওয়া ও ক্ষমা করাও কি সম্ভব? পেশোয়ারে কিশাখানির রাজপথে আহত শিশুদের পর্যন্ত তিনি পদাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কত আহত শিশুর আকুল ক্রন্দন এই বর্বরের পদাঘাতে অন্তিমের বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে। এমনকি ডাঃ খান সাহেব গুলীব আঘাতে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করিতে গেলে তাঁহাকে বাধা দেওয়া হয়। এই সমস্ত অত্যাচারের চিহ্ন বহন করিয়া বহু অক্ষম ও বিকৃতাঙ্গ পাঠান এখনও বাঁচিয়া আছে।

বিভিন্ন স্থানে অত্যাচার—গুলীবর্ষণ, গৃহদাহ ও ছাদ হইতে নিক্ষেপ

কোহাট, বান্নু, ডেরা-ইসমাইল খাঁ প্রভৃতি স্থানেও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছে। নির্যাতনের নানারূপ প্রক্রিয়ার মধ্যে শীতের কনকনে ঠাণ্ডার ভিতরে তাহাদের নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়া ততোধিক ঠাণ্ডাজলে নিক্ষেপ করা হইত।

প্রতিবৎসর নববর্ষে সৈন্যদের উৎসব পেশোয়ার জেলার মাসোখেল ও মহম্মদির অধিবাসীদের মনে তাহাদের উপর সৈন্যদের নৃশংস অত্যাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৯৩১ সালে নববর্ষের দিন উৎসবোন্মত্ত সৈন্যদল ঐ দুইটি গ্রাম আক্রমণ করে এবং নানারূপ অত্যাচার ও অনাচারের দ্বারা গ্রামবাসীদের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তোলে। ১৯৩০ সালে ২৮শে মে মর্দান জেলার টক্‌কর্ গ্রামে হানা দিয়া সৈন্যরা বহু খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারকে হত্যা করে। সোয়াবিতে সৈন্যরা বহু

শস্যক্ষেত্র নষ্ট করে এবং তেল ঢালিয়া সংগৃহীত শস্য খাদ্যের অনুপযোগী করিয়া দেয়। উটামানজাই গ্রাম খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কেন্দ্র। সৈন্যরা এই স্থানের অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। সশস্ত্র আক্রমণকারীরা সর্বপ্রথম গ্রামখানি ঘেরাও করে। অতঃপর গ্রামবাসীদের উপর গুলীবর্ষণ ও নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে থাকে। গ্রীষ্মের কঠোর উত্তাপে তাহাদের রৌদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। ভারী পাথর বহন করিয়া তাহাদের পাহাড়ে উঠিতে বাধ্য করা হয়। উন্মত্ত সৈন্যরা নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরিয়া বলপূর্বক গৃহের ছাদ হইতে ফেলিয়া দেয়। তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেয় ও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সঙ্ঘ-অফিস ভস্মীভূত করে।

পণ্ডিত নেহেরুর উক্তি

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গফুর খানের মুখে সীমান্ত-প্রদেশের এই সমস্ত অত্যাচারের কথা শুনিয়া ঐ সকল ঘটনার যথাযথ প্রচার না হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল ১৯৪২ সালের ১৫ই জানুআরি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ওয়ার্ধা অধিবেশনে সীমান্ত-প্রদেশে যে সমস্ত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন,—"ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আমাদের জনগণের সমস্ত পটভূমিকা ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অত্যাচার ও পরে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের নির্যাতনের কথা আমাদের মনে পড়ে এবং ১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দে সীমান্ত-প্রদেশে যে সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত

হইয়াছে সে সম্পর্কেও আমি সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি। এই সমস্ত ঘটনা কি কেহ ভুলিতে পারে ?”

পেশোয়ার তদন্ত কমিটি

সীমান্ত-প্রদেশে এই সকল শোচনীয় ঘটনাবলীর বিস্তারিত তদন্তের জন্য কংগ্রেস স্বর্গত বিঠলভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে “পেশোয়ার তদন্ত কমিটি” নাম দিয়া একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির তদন্তের ফল প্রকাশের অনতিবিলম্ব পরই গভর্নমেণ্ট তাহা নিষিদ্ধ করিয়া দেন।

“প্যাটেল রিপোর্ট,” “ইণ্ডিয়া লীগ ডেলিগেশনের রিপোর্ট” ও ফাদার বেরিয়ার এলউইনের “সীমান্ত সম্পর্কে সত্য ঘটনা” মারফত সীমান্ত-প্রদেশের অত্যাচারের কাহিনী কিয়ৎপরিমাণে জনশ্রুতি লাভ করিয়াছে।

সীমান্তবাসীদের বীরত্ব ঃ বাদশা খানের উপর অবিচলিত বিশ্বাস

নির্ভীক চিত্তে সমগ্র প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া পাঠানগণ যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে ভারতের অহিংস-সংগ্রামের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত খুবই অল্প। বাদশা খানের উপর পাঠানদের অপরিসীম বিশ্বাস, তাঁহার আদর্শে তাহাদের আন্তরিক নিষ্ঠাই সুমহান্ নির্ভরের মত তাহাদের সমস্ত অত্যাচার ও অনাচারের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি ও সাহস দিয়াছে। বিপদকে তাহারা বিপদ মনে করিয়া মুস্ড়াইয়া পড়ে নাই। মুহূর্তের জন্যও তাহারা বিশ্বাস হারায় নাই। শত লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের মধ্যেও সংগ্রামের নূতন পদ্ধতির প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা অবি-

চলিত ছিল। তাহাদের মনে একমাত্র বিশ্বাস, বাদশা খান কখনও তাহাদের বিপথে চালিত করিতে পারেন না। তাঁহার শিক্ষা, ধর্ম, কর্ম ও চিন্তা সমস্তই স্বদেশের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত। তাঁহার জীবন মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত। তাঁহার শিক্ষা পাঠানদের নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। গফুর খান পাঠানদের অহিংসামন্ত্রের দীক্ষাগুরু। সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা, অহিংসার প্রতি তাঁহার আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে স্বতঃস্ফূর্ত। পাঠানদের বিশ্বাস বাদশা খান একজন পয়গম্বর। মানবের মুক্তির জন্য সত্য ও প্রেমের বাণী লইয়া তিনি তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যে পুকুরের জল পান করেন পাঠানদের নিকট সেই জলাশয়ের জল পবিত্র হইয়া উঠে। তাহাদের বিশ্বাস সেই জলপানে দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হইবে। তিনি যে জলাশয়ের জল পান করিতেন সেই জল লইবার জন্য সেখানে রীতিমত ভীড় জমিয়া যাইত।

সরকারের মিথ্যা প্রচারকার্য

সীমান্ত-কর্তৃপক্ষরা ঘোষণা করেন যে, মস্কোস্থিত রুশদের সহিত 'লালকোর্তাদের' মিতালি আছে এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলন হইতে গফুর খানের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য তাঁহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সমস্ত সংগঠন ও শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই সীমান্তের কর্তৃপক্ষরা এই অজুহাতের সৃষ্টি করেন। সমাজতন্ত্রবাদ ভারতবর্ষ পছন্দ করে কারণ তাহাদের বিশ্বাস অনুরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় তাহাদের জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান হইবে। সমাজ-তন্ত্রবাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর জন্যই ভারতবাসী সমাজ-

তন্ত্রবাদের তারিফ করে। সমাজতন্ত্রবাদের সহিত সহানুভূতিশীল বলিয়াই রুশিয়ার সহিত তাহাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এক্ষণে নিঃসন্দেহে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের রাজনৈতিক বা অন্য কোন প্রকার সংস্রবই নাই, বা কোনদিন ছিলও না এবং গভর্নমেণ্ট এইরূপ মিথ্যা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ করিয়াছেন।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের কংগ্রেসে যোগদান

১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সীমান্ত-প্রদেশের সমস্ত বিশিষ্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হয়। এই দুই বৎসর চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সীমান্তবাসিগণ তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। এই সময় সীমান্তের ৩ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রদেশের বাহিরে প্রভাবসম্পন্ন মুসলমান নেতাদের পরামর্শ ও সাহায্য চাহিবার উদ্দেশ্যে বাহির হন। তাঁহারা খ্যাতিসম্পন্ন বহু মুসলমান নেতার সহিত দেখাশুনা, আলাপ-আলোচনা করেন কিন্তু কাহারও নিকট হইতে ঠিক আন্তরিক সহানুভূতি বা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান না। অতঃপর তাঁহারা মিঞা ফজল-ই-হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সীমান্ত-প্রদেশের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং এই অবস্থা-বিপর্যয়ে তাঁহাদের কি কর্তব্য সে সম্পর্কে তাঁহার পরামর্শ চাহেন। ফজল-ই-হোসেন তাঁহাদের বলেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে মুসলমান নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে তাঁহাদের সাহায্য আশা করা বৃথা। হয় তাঁহারা নিজেরাই তাঁহাদের বিপদের সম্মুখীন হউন, আর তাহা যদি

সম্ভব হয় তবে এ সম্পর্কে তাঁহারা কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন। যদি কংগ্রেস সীমান্ত-প্রদেশের বিপদকে বৃহত্তর জাতীয় বিপদের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সীমান্ত-সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। স্যার ফজল-ই-হোসেন তাঁহার স্বধর্মীদের ভালরূপেই চিনিতেন এবং তাঁহাদের সমর্থন যে কোন পক্ষে তাহাও তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না।

অতঃপর সীমান্ত-প্রদেশের এই তিনজন নেতা মুসলমান নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্যের প্রত্যাশা না দেখিয়া অগত্যা কংগ্রেসের দরজায় গিয়া ঘা দিলেন। সীমান্ত-আন্দোলনের সহিত কংগ্রেস পূর্ণ সহানুভূতি জানায় এবং নেতৃবৃন্দ গফুর খানের আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। বাদশা খান তখন গুজরাট জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁহাকে সমস্ত বিষয় জানান হয়। তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিয়া খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার বাহিনীকে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির ১৩ই আগস্ট অধিবেশনে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। এইরূপে সীমান্তের খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলন বৃহত্তর ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়।

গান্ধী-আরুইন চুক্তির ফলাফল : নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার

গান্ধী-আরুইন চুক্তি-সম্পাদনের পর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয় এবং যাহারা হিংসাত্মক কার্যের জন্য বন্দী নহে এইরূপ সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়। খাঁ আবদুল গফুর খানও এই সময় মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু

গান্ধী-আরুইন-চুক্তি অধিক কাল স্থায়ী হয় না। করাচী অধিবেশনের পর নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ প্রদেশে ফিরিয়া যান এবং কংগ্রেস কমিটি গঠন করিয়া সংগঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং করা গঠনমূলক কার্যের অন্তর্ভুক্ত। যে সমস্ত স্থানে কর-বন্ধ আন্দোলনের জন্য সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ ছিল সে সকল স্থানে পুনরায় যথারীতি কর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেসীদের এই সমস্ত কাজ আমলাতন্ত্র ভাল চোখে দেখেন না। কংগ্রেসের কর্তৃত্ব বা মর্যাদা বাড়ে, তাঁহাদের ইহা মোটেই কাম্য নহে। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষেত্রেই আবার সরকারী জুলুম আরম্ভ হয়। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারের স্বাভাবিক কর্মসূচীর মধ্যেও পুলিস হস্তক্ষেপ আরম্ভ করে। গান্ধী-আরুইন-চুক্তির কয়েক মাসের মধ্যেই আবার সহস্র সহস্র কর্মী কারারুদ্ধ হন। আবদুল গফুর খান ও ডাঃ খান সাহেবও পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এক অর্ডিনান্স জারী করিয়া খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার বাহিনীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ডাঃ খান সাহেবকে নৈনী সেণ্ট্রাল জেলে আটক রাখা হয়। গফুর খানকে বিহারে হাজারীবাগ জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে ১৯৩৪ সালের শেষভাগ পর্যন্ত তাঁহারা কারারুদ্ধ থাকেন। ডাঃ খান সাহেবের পুত্র সাদুল্লা খানকেও গভর্নমেণ্ট গ্রেপ্তার করেন। তাঁহাকে বারাণসী জেলে আটক রাখা হয়। ডাঃ খান সাহেব পণ্ডিত নেহেরুর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এলাহাবাদ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং গফুর খান মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিবার জন্য বোম্বাই রওনা হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় গভর্নমেণ্ট উভয়কেই গ্রেপ্তার করেন।

গোল টেব্‌ল্‌ বৈঠক

১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে ইংলণ্ডে পরপর দুইটি গোল টেব্‌ল্‌ বৈঠকের অধিবেশন হয়। কিন্তু এই বৈঠকে বিশেষ কোন ফল হয় না। প্রথম বৈঠকে সরকার বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় হইতে এমন সব প্রতিনিধি বাছাই করিয়া নেন যাহারা নিজ-স্বার্থ, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ ছাড়া জাতীয় স্বার্থের কথা কোনকালে চিন্তাও করে নাই। দ্বিতীয় গোল টেবল্‌ বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত থাকেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও এই বৈঠকে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, রাজস্ব ও বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে ভারতবর্ষের মতামত বিবৃত করেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এবারও কংগ্রেস তথা ভারতের মূল দাবি এড়াইয়া যান। দ্বিতীয় গোল টেব্‌ল্‌ বৈঠকের ফলে সীমান্ত-প্রদেশকে গভর্নর-শাসিত প্রদেশের মর্যাদায় উন্নীত করা ছাড়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় না। ১৯৩৩ সালে সীমান্ত-প্রদেশ গভর্নর-শাসিত প্রদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়।

ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন

১৯৩৩ সালে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন হয়। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে মূল দাবি এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং সীমান্ত-প্রদেশের অনেক বিশিষ্ট নেতা তখন পর্যন্ত কারারুদ্ধ হইয়া আছেন। এইরূপ অবস্থায় সীমান্তের অধিবাসিগণ

প্রাদেশিক গভর্নরের সহিত কোনরূপ সহযোগিতা করা নিরর্থক হইবে বলিয়া মনে করে। সুতরাং এই নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে কোন উৎসাহই দেখা যায় না। অতি অল্পসংখ্যক লোকই ভোট দেয়। চারসাদ্দাতে মাত্র ১ জনকে ভোট দিতে দেখা যায়। এই নির্বাচনের ফলাফল যে কি দাঁড়াইবে তাহা বুঝা শক্ত নহে। এই নির্বাচনের ফলে চরম প্রতিক্রিয়াশীল একদল লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ৬ জন ইংরাজ ও একজন ভারতীয়, স্যার আবদুল কায়ুম খানকে লইয়া সীমান্ত-প্রদেশে একটি ভারতীয় মন্ত্রী-পরিষদ গঠিত হইল।

আইন-অমান্য স্থগিত

গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি মারফত আইন-অমান্য-আন্দোলন বন্ধ রাখিয়া জাতিগঠন-মূলক কর্মপদ্ধতি অনুসরণের উপর বিশেষ জোর দিতে নির্দেশ দেন। ইহার পর পণ্ডিত মালব্যজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের পাটনা অধিবেশনে আইন-অমান্য-আন্দোলন স্থগিত রাখা সম্পর্কে মহাত্মাজীর অনুরোধ সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। আইন-অমান্য-আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে সরকারের পক্ষে দমননীতি অনুসরণের আর বিশেষ কোন হেতু রহিল না। ১৯৩৪ সালে ১২ই জুন তারিখে অধিকাংশ কংগ্রেস কমিটির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি এবং বাঙ্গলা ও গুজরাটের বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর তখনও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ

থাকে। তবে রাজবন্দীদের সকলকেই একে একে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে গফুর খান মুক্তি লাভ করেন। ডাঃ খান সাহেবও এই সময় মুক্তি লাভ করেন কিন্তু উভয়েরই পাঞ্জাব অথবা সীমান্ত-প্রদেশ প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া গভর্নমেণ্ট এক আদেশ জারী করেন।

গফুর খানের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ

জেল হইতে বাহির হইয়া গফুর খান ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। এই সময় নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা ছাড়াও ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানিবার আগ্রহ বশতঃ তিনি সুদূর পল্লী-অঞ্চলসমূহও পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। এই সময় ভারতের জনসাধারণ তাঁহাকে জানিবার সুযোগ লাভ করে। লোকের সহিত মিশিবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। তিনি সদা হাস্যমুখে সরল মনে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র নর-নারীদের সহিত কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা করিতেন। তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন। তাঁহার মন শিশুদেরই মত সরল। তিনি শিশুদের সঙ্গ ভালবাসেন। ইহা হইতে তাঁহার অন্তরের কোমল দিকটির পরিচয় আমরা পাই। তাঁহার অন্তরের আর একটা দিক আছে—তাহা তাঁহার ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাস ও দৃঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা। এই কোমল-কঠোরে তাঁহার চরিত্র গঠিত। তাই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের প্রতিকূল আবহাওয়া ও নির্যাতনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি আজও সসম্মানে সগর্বে ভারতের মানবসমাজে তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

আর্ত ও দরিদ্রের প্রতি গফুর খানের দরদ

নির্যাতিত আর্ত দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতি গফুর খানের অন্তর দরদে পরিপূর্ণ। তিনি নিজেও অতি দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করেন। তাঁহার বেশভূষায়, আহার ও বাসস্থানে বিন্দুমাত্রও আড়ম্বর বা বিলাসের ছাপ নাই। তিনি মিতব্যয়ী ও একান্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। একজন দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে যাহা জোটান সম্ভব তিনি তাহার অধিক আহার করেন না। তাঁহার সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিলে নিশ্চয়ই অবান্তর হইবে না।

১৯৩৪ সালে মুক্তিলাভের পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করিবার সময় তিনি বাঙ্গলা দেশেও আসেন। বাঙ্গলায় থাকাকালীন একবার তিনি বিখ্যাত ফরওয়ার্ড ব্লকনেতা মৌলবী আশ্রাফউদ্দীন আহাম্মদ চৌধুরীর কুমিল্লা জেলার সুয়াগঞ্জ গ্রামের বাটীতে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। চৌধুরী সাহেব তাঁহার রাজোচিত সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। তাঁহার জন্য পৃথকভাবে উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীসমূহ রন্ধনের ব্যবস্থা হয়। আহারের প্রচুর আয়োজন করা হইল, কিন্তু গফুর খান আহারে স্বীকৃত হইলেন না। আয়োজনের প্রাচুর্য বোধ হয় তাঁহার মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'যে দেশে অনাহারে লোক মরে, সেখানে ভাল খাদ্যসামগ্রী খাওয়ার অধিকার তাঁহাদের নাই।' চৌধুরী সাহেব তাঁহার বেদনার কারণ বুঝিতে পারিয়া পুনরায় তাঁহার জন্য অতি সাধারণভাবে রন্ধন করাইলেন। গফুর খান এবারে পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন।

গান্ধী আশ্রমে গফুর খান

এই সময় গফুর খান ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত বহুদিন একত্রে অতিবাহিত করেন। গান্ধীজী গফুর খানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাহার পর হইতে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এই দুই মনীষীর মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হইয়া উঠে। যে সময় হইতে তাঁহারা স্ব স্ব প্রেরণা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, দুইজনের কর্মক্ষেত্র ও পটভূমিকা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের উভয়ের কর্মপন্থা, আদর্শ ও চিন্তাধারার মধ্যে হুবহু সাদৃশ্য দেখা যায়। অহিংসার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অহিংসার ভিত্তিতে ভারতের মূল সমস্যা সমাধানের উপর একান্ত বিশ্বাসে উভয়ের মধ্যে হুবহু সাদৃশ্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

গান্ধী নামের সার্থকতা কোথায়

সীমান্ত-গান্ধী নাম হইতে কেহ যদি গফুর খানকে তাঁহার অহিংস কর্মপন্থার জন্য মহাত্মা গান্ধীর নিকট ঋণী বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে অত্যন্ত ভুল হইবে। গফুর খান গান্ধীজীর প্রভাবে আসিয়া অহিংসার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। তাঁহার কিছুই অনুকরণলব্ধ নহে বলিয়াই দুইজন জনপ্রিয় গণনেতার মধ্যে আদর্শগত ঐক্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিলে তবেই আমরা তাঁহার 'সীমান্ত-গান্ধী' নামের সার্থকতা খুঁজিয়া পাই। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় গফুর খানও একজন সত্যদ্রষ্টা। চিন্তাধারার স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছপ্রবাহে সত্য তাঁহার নিকট উদ্ভাসিত। সত্যের প্রতি

তাঁহার নিষ্ঠা, অহিংসার প্রতি তাঁহার আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে স্বতঃস্ফূর্ত।

কেন্দ্রীয় পারিষদে ডাঃ খান সাহেব

১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় পরিষদে সীমান্ত-প্রদেশ হইতে একজন সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। সীমান্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস এই সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা স্থির করিয়া ডাঃ খান সাহেবকে প্রার্থী মনোনীত করেন। তখন পর্যন্ত ডাঃ খান সাহেবের উপর হইতে সীমান্ত-প্রবেশ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় নাই। নির্বাচনে ডাঃ খান সাহেব যাহাতে জয়যুক্ত হইতে না পারেন সেজন্য সরকার যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। কিন্তু গভর্নমেণ্টের জনসাধারণকে ভ্রান্তপথে চালনা করিবার সমস্ত অপপ্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। ডাঃ খান সাহেব বিপুল ভোটাধিক্যে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

ইহার কিছুদিন পর ডাঃ খান সাহেবের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় এবং তিনি পুনরায় পেশোয়ারে ফিরিয়া তাঁহার চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করেন। ডাঃ খান সাহেব কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যরূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি পরিষদে বহুবার সীমান্ত-প্রদেশে সরকারের অনুসৃত দমন-নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। সাধারণ নির্বাচনের সময় পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদে থাকেন। অতঃপর তিনি প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

সরকারী দমননীতির নিন্দা ঃ গফুর খান গ্রেপ্তার

কংগ্রেস সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখিল। ব্যবস্থা-পরিষদ সমূহে দমন-নীতির নিন্দা করিয়া একাধিক প্রস্তাব গৃহীত হইল।

জনমতও ইহার ঘোরতর বিরোধিতা করে; কিন্তু সরকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বাঙ্গলা ও সীমান্ত-প্রদেশে বহু কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান তখনও বে-আইনী রহিয়া গেল। নেতৃবর্গও স্থানে স্থানে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। নির্বাচনের সময় গফুর খান ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময় বোম্বাইয়ে ইয়ং খ্রীষ্টান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এক সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য গফুর খান এক আমন্ত্রণ পাইলেন। গফুর খান বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সীমান্তে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলন ও আন্দোলন দমনকল্পে সরকারী অত্যাচারের নৃশংস কাহিনী তাঁহার স্বভাবসুলভ স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিলেন। এই বক্তৃতার জন্য গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার ও তুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এইরূপ শুনা যায় যে, গফুর খানের কনিষ্ঠ পুত্র ওয়ার্ধা হইতে পিতার গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া গান্ধীজীর নিকট বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি এখনও বাহিরে রহিলেন অথচ আমার পিতাকে গ্রেপ্তার করা হইল, ইহার অর্থ কি?" ইংরাজ শাসকদের চোখে তাঁহার পিতা যে কি সাংঘাতিক লোক তাহা বুঝা হয়ত তাহার পক্ষে সে সময় ততটা সহজ হইয়া উঠে নাই।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

সুদীর্ঘ ৬ বৎসর নির্বাসন ও কারাভোগের পর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গফুর খান স্বদেশে পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। দীর্ঘ কারালাঞ্ছনা ও নির্যাতনে নিপীড়িত, আত্মত্যাগে সুমহান্ স্বাধীনতা সাধনার এই বীর পুরোহিতকে আবার তাহাদের মধ্যে

ফিরিয়া পাইয়া পাঠান জনসাধারণ আনন্দে, শ্রদ্ধায়, প্রেরণায় উদ্বেলিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। বাদশা খানকে তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াই তাহাদের আনন্দ। সীমান্তের অধিবাসিগণ শুধু তাঁহাকে নেতা হিসাবে নহে, নিপীড়িত জনগণের বন্ধু হিসাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে ও ভালবাসে। ফকির ই-আফগান যে তাহাদের দুঃখের দরদী, শোকের সান্ত্বনা বিপদেব সহায়। গফুর খান্ স্বদেশবাসীর মঙ্গলের প্রতীক।

স্বদেশে ফিরিবার পর পেশোয়ারে এক বিরাট জনসভায় সীমান্তবাসীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়।

কর্মের আহ্বান

সমবেত অগণিত খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারগণ আবার তাহাদের পরম আত্মীয়ের পরিচিত কণ্ঠস্বরে কর্মক্ষেত্রে যাত্রাসুরুর ইঙ্গিত শুনিতে পাইল। সে তো শুধু বক্তৃতা নহে—সে কণ্ঠস্বর জাতিকে নূতন প্রেরণায় নূতন পথে যাত্রার আহ্বান। 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ। ওঠো জাগো'। তাহাদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, 'বরপ্রাপ্তি' অক্ষমের জন্য নহে, সুপ্তের জন্য নহে, দুর্বলের জন্য নহে!—"ঈশ্বরের করুণায় আমি আবার তোমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের আনন্দে যোগদান করিতে পারিয়াছি। আমাদের প্রকৃত আনন্দ এখনও অনাগত ভবিষ্যতের অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে। যতদিন আমাদের লক্ষ্যে না পৌছিতেছি ততদিন আমাদের সব আনন্দই নিরর্থক। আমাদের মুক্তি-আন্দোলন আজ এমন এক স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে, যে অবস্থায় আমাদের আরও বৃহৎ আত্মত্যাগের

প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। আমার বিশ্বাস তোমরা সকলেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছ। আমার দিক হইতে আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তোমাদের পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিয়া দেশে প্রকৃত 'গণ-রাজ' প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আমি মুক্তি-সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে দৃঢ়সংকল্প।"

ভারত-শাসন আইন

১৯৩৫ সালে ভারত-শাসনমূলক একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন 'গভর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫' বা 'ভারত-শাসন আইন, ১৯৩৫' নামে পরিচিত। এই আইন, অনুসারে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুআরি মাসে নূতন শাসনবিধি প্রবর্তিত হয়। ১১টি প্রদেশে নূতন নিয়মে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এই সময় সীমান্ত গভর্নরের প্রচেষ্টায় সীমান্ত-প্রদেশে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়; কিন্তু তাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

সাধারণ নির্বাচনে বাধা-নিষেধ

সাধারণ নির্বাচনের সময় গফুর খানের সীমান্ত-প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নির্বাচনী প্রচারকার্যের জন্য সীমান্ত-প্রদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া সরকার তাঁহার সীমান্ত-প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। নির্বাচন-কার্য সুরু হইলে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও ভুলাভাই দেশাইকে সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারকার্যের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য

ছিল সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেস কমিটিসমূহ বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় নির্বাচনী প্রচার ও নির্বাচন-সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য স্থানীয় জনপ্রিয় নেতৃগণকে লইয়া একটি পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করা এবং নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের অন্যান্যভাবে সাহায্য করা ; কিন্তু দুই-একটি জেলা পরিভ্রমণ করিবার পরই তাহাদের অন্যান্য জেলা-প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে একমাত্র ডাঃ খান সাহেবের উপর নির্বাচন-সংক্রান্ত সমস্ত কাজের বোঝা আসিয়া পড়ে। সরকারী কর্মচারীরা খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের নির্বাচন-সংক্রান্ত সমস্ত প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে নানা উপায়ে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন। সীমান্তে সরকারী কর্মচারীরাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রচারকার্য চালান। কিন্তু তাহাদের সমস্ত অপপ্রচার ব্যর্থ হয়। প্যাটেল ও দেশাই সীমান্ত-প্রদেশে যাওয়ার কিছুদিন পূর্বে মিঃ জিন্না তাঁহার নবগঠিত দলের জন্য সমর্থন জোগাইবার উদ্দেশ্যে সীমান্ত-প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। মিঃ জিন্নার প্রচারকার্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ কিন্তু কোনরূপ বাধা দেয় নাই। এইরূপ সুবিধা সত্বেও জিন্না সাহেব পাঠানদের মন অধিকার করিতে কৃতকার্য হইলেন না। লীগ দলপতির অনুচরবৃন্দের পাকিস্তানের জিগীর ও 'ইসলাম বিপন্নের' ধুয়া তুলিয়া সীমান্তের মুসলমান সম্প্রদায়কে দলে টানিবার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যায়।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গাররা সীমান্ত-প্রদেশের সর্বত্র সভা-শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়া কংগ্রেসের বাণী প্রচার করে ; কংগ্রেসের আদর্শ ও মুক্তির বার্তা পাঠানদের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়। মর্দান ও সোয়াবি জেলায় নির্বাচনে বিপুল উদ্দীপনার

সঞ্চার করে। সোয়াবি জেলায় জনৈক খ্যাতিসম্পন্ন ঐশ্বর্যশালী ভূস্বামী খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার প্রার্থীর সাহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। সোয়াবি জেলায় ভোটদাতাদের সংখ্যা প্রায় ৬০০০। সেই ভূস্বামী তাঁহার জয়লাভ সম্বন্ধে এতদূর নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তিনি একবার ডাঃ খাঁন সাহেবের সম্মুখে সগর্বে ঘোষণা করেন, 'মোট ছয় হাজার ভোটের মধ্যে তিন হাজার ভোট তাঁহার পকেটে জমা হইয়াছে।" তাহার উত্তরে ডাঃ খান সাহেব রসিকতা করিয়া বলেন যে, তিনি তাঁহার পকেটে একটি ছিদ্র করিয়া দিয়াছেন এবং ভোট গ্রহণ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সেই ছিদ্র দিয়া পকেট হইতে সমস্ত ভোট গলাইয়া পড়িয়া যাইবে।

সীমান্তে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা

নির্বাচনের পরে ইহা অবধারিত হইল যে, সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব। নিখিল ভারত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ সীমান্তে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে গফুর খানের সহিত পরামর্শের জন্য এবোটাবাদে গমন করেন। এবোটাবাদে পরিষদের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। নেতৃদ্বয় খান আবদুল গফুর খানের সহিত আলোচনা ও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সংগঠন ও প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া তথায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে পরামর্শ দেন।

কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বে সীমান্ত-গভর্নরের প্রচেষ্টায় একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা মোটেই জন-প্রিয় হয় নাই। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের ৩রা সেপ্টেম্বরের

অধিবেশনে উক্ত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পর ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

নূতন সূচনা

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের হাতে ক্ষমতা আসিবার পর পাঠানদের জাতীয় জীবনের সকল স্তরে নূতন পরিবর্তন সূচিত হয়। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বে সীমান্তের অধিবাসিগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। তাহাদের ধন-প্রাণ-মানের কোনই নিরাপত্তা ছিল না। সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই প্রদেশ হইতে সর্বপ্রথম দুর্নীতি-দূরীকরণে ব্রতী হইলেন। জনস্বার্থহানিকর ও অকেজো প্রতিষ্ঠানসমূহের একে একে উচ্ছেদসাধন করা হইল। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। এই সকল ম্যাজিস্ট্রেট নামধারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা জনহিতে লাগাইবার পরিবর্তে অপব্যবহারই করিতেন। মন্ত্রিমণ্ডলী স্থানীয় সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে মনোনীত সদস্য-পদগুলিও একে একে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। দরিদ্র কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি-আইনের সংশোধন করা হইল এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্যও মন্ত্রিমণ্ডলী যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

সীমান্তে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মুসলীম লীগের অসারতা

সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের পর একদল লোকের মনে যেমন আশা-আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হইল, তেমনি

আবার ভূস্বামী, সরকারী বেতনভুক্ কর্মচারী ও কায়েমী স্বার্থের কয়েকশ্রেণীর লোক তাহাদের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই শ্রেণীর লোকেরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে সীমান্ত-প্রদেশে নিখিল ভারত মুসলীম লীগের একটি প্রাদেশিক কমিটি গঠন করিল। সীমান্তে ব্যবস্থা-পরিষদে তাহাদের লইয়াই বিরোধী দল গঠিত হয়। তাঁহাদের কোন রাজনৈতিক কর্মসূচীও ছিল না বা তাঁহারা কোন নিয়ম-শৃঙ্খলারও ধার ধারিতেন না। নেতা বলিতে সেরূপ জনপ্রিয় কর্মীও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন না। জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য যাহা করা প্রয়োজন, সেরূপ কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থার একান্ত অভাববশতঃ তাঁহাদের প্রভাব কয়েক শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। এই সকল লোকের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল বিদেশী শাসনে তাঁহাদের কায়েমী স্বার্থের পুষ্টিসাধন করা।

সংগঠন-শক্তি বা জনপ্রিয়তা কোন দিক দিয়াই সীমান্তের মুসলীম লীগ দল খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সমকক্ষ নহে। তাহারা ইসলাম বিপন্নের ধুয়া তুলিয়া খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার ও বাদশা খানের বিরুদ্ধে নানারূপ কটূক্তি করিতে থাকে। কিন্তু অতীতের সেবা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার প্রতি চাহিয়া সীমান্তের অধিবাসিগণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত বাদশা খানের নেতৃত্ব মানিয়া চলে। গফুর খান পাঠানদের শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বারবার বিদেশী শাসকদের রোষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া তিনি স্বেচ্ছায় ক্লেশ ও কারাবরণ করেন। আর সেই সময় সীমান্তে

স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত লীগ-দলভুক্ত নবাব, ভূস্বামী ও সরকারী চাকুরিয়ার দল তাঁহাদের অপরিমিত লালসার পরিতৃপ্তির মানসে দরিদ্র জনসাধারণের সর্বনাশসাধনে নিয়োজিত ছিলেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার জনপ্রিয়তা

পরবর্তী প্রায় আড়াই বৎসর সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকাকালীন মুসলীম লীগের প্রধান চেষ্টা ছিল কি করিয়া পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি নষ্ট করা যায়। কিন্তু তাহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ প্রসারলাভই করিতেছে।

১৯৩৯ সালের ৬ই নভেম্বর সীমান্ত-প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে যুদ্ধ সম্পর্কিত কংগ্রেসের প্রস্তাবটি বিনা বাধায় গৃহীত হয়। একমাত্র সীমান্ত-প্রদেশেই কংগ্রেসের যুদ্ধ-সম্পর্কিত প্রস্তাব বিনা বিরোধিতায় গৃহীত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ইহার ২ দিন পরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। গ্রেটব্রিটেন মহাসমরে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষকেও সমররত দেশ বলিয়া ভারতসরকার ঘোষণা করেন। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় পরিষদের মতামত গ্রহণও আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। উপরন্তু যুদ্ধজনিত অবস্থার অজুহাতে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ও অর্ডিনান্স জারী হইতে থাকে। ব্রিটেন তথা মিত্রশক্তিবর্গ

গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া সমরে অবতীর্ণ হন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই সময় এক বিবৃতির মারফত এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কংগ্রেস গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ও নাৎসীবাদের ঘোরতর বিরোধী। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট গণতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ভারতে গণতন্ত্র স্বীকার করিয়া লওয়া ব্রিটেনের একান্ত কর্তব্য। সেইরূপ ক্ষেত্রে কংগ্রেস গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধে ব্রিটেনের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবে। কমিটি ব্রিটেনের নিকট হইতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বিবৃতির দাবি করে। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দু-মহাসভা প্রভৃতির অন্যূন ৫২ জন প্রতিনিধির সহিত স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার শাসন-পরিষদ বর্ধিত করিয়া গণ-প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব করেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক শর্ত জুড়িয়া দেন যে, কংগ্রেসকে এই সদস্য-সংখ্যা ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই মিঃ জিন্নার সহিত একমত হইতে হইবে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২২শে অক্টোবর কর্তৃপক্ষকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য জানাইয়া মন্ত্রিসভা-গুলিকে পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দেয়। নভেম্বর মাসের মধ্যেই একে একে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করে। সীমান্ত-প্রদেশে ডাঃ খান সাহেব ও তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীও পদত্যাগ করেন। ইহার পর ৭টি প্রদেশে গভর্নর বিশেষ ক্ষমতা-বলে শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী এবারে পুনরায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন বটে, তবে এইবারের আন্দোলন নির্দিষ্টসংখ্যক কর্মীর মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলেন। তাহা সত্ত্বেও এই আন্দোলনে ওয়ার্কিং কমিটির

১১জন সদস্য সহ বহু কংগ্রেস-নেতা কারারুদ্ধ হইলেন। কংগ্রেস ১৯৪১ সালের প্রথম দিকে আন্দোলন স্থগিত করে।

গফুর খানের দূরদৃষ্টি

গফুর খান ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দেন। পুণা-চুক্তি সম্পর্কে সহকর্মী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত মতানৈক্যই তাঁহার পদত্যাগের কারণ। গফুর খান একবার যাহা ন্যায়সঙ্গত ও আদর্শসম্মত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হন না। আদর্শের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠার জন্য বাহিরের প্রভাবে তিনি কখনও বিবেকের সহিত আপস করিতে রাজী নহেন। ইহাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পুণা-চুক্তি লইয়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে নানা বিতর্ক ও আলোচনা চলে। অহিংসা ও মানবসেবা গফুর খানের জীবনের আদর্শ। তিনি স্পষ্টভাষায় এই চুক্তির বিরোধিতা করিয়া বলেন, "আমরা খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার। আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জন করা। কিন্তু এই সঙ্গে আমরা মানবসেবার জন্যও শপথ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য কেনই বা আমরা অন্য জাতির যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে যাইব? এই উপায়ে অর্জিত স্বাধীনতা একটি প্রহসন মাত্র এবং কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। আমরা যুদ্ধ ও যুদ্ধে অনুষ্ঠিত বর্বরতার নিন্দা করিয়া আসিতেছি। এখন আমাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করিবার সময় আসিয়াছে এবং যুদ্ধের সহিত আমাদের জড়িত করিবার সমস্ত অপকৌশল ব্যাহত করিবার সময় সমুপস্থিত।" সীমান্তের অধিবাসিগণও গফুর খানের সিদ্ধান্ত

সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। ১৯৪০ সালের ৯ই আগস্ট এবোটাবাদে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গফুর খানের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।

ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন হইতে থাকে এবং পুণা-চুক্তির কিছুদিন পরেই কংগ্রেসকে ফিরিয়া পুনরায় পুরাতন পথ অবলম্বন করিতে হয়। গফুর খান পূর্বেই যাহা বুঝিয়াছিলেন প্রকারান্তরে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। গফুর খান একবার যাহা আদর্শ ও কর্মপন্থার পরিপন্থী বলিয়া উপলব্ধি করেন তাহা লইয়া মাথা ঘামাইয়া সময় নষ্ট করা মোটেই পছন্দ করেন না।

সংগ্রামের আহ্বান

ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিবার পর বাদশা খান খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সংগঠিত করিবার জন্য সবশক্তি নিয়োগ করেন। চরম সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পাঠানরা যাহাতে সেই সংগ্রামে যথাযথ অংশগ্রহণ করিতে পারে সেজন্য সংগঠন ও শক্তি সঞ্চয় করার জন্য সারদোয়াবে তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। পরবর্তী দুই বৎসর তিনি গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। বাদশা খান গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে অহিংসা ও মুক্তির বাণী পৌঁছাইয়া দেন। বাদশা খানের মুখনিঃসৃত বাণী তাহাদের অন্তরে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। সমস্ত ক্লীবতা দূর করিয়া বাদশা খান তাহাদের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করেন ঃ—

"তোমরা বহুদিন যাবত 'ইন্‌-ক্লাব জিন্দাবাদ' (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক) এই ধ্বনি করিয়া আসিতেছ। এক্ষণে প্রকৃতই

উহা আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তোমরা পছন্দ কর আর না কর উহার ফলাফল আমাদের উপর ছড়াইয়া পড়িবেই। ইংরাজ যে-কোন দিন এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। কারণ অন্যান্য শক্তি অধিকতর বলশালী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং সর্বত্র তাহাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতেছে। তোমরা কি করিবে স্থির করিয়াছ? অপর কোন শক্তি আসিয়া এই দেশের উপর কর্তৃত্ব করুক তোমরা কি সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে চাহ? আমি খোদার নামে তোমাদের এই অনুরোধ করি যে, প্রত্যহ নূতন স্বামীর অনুসন্ধান-রত স্ত্রীলোকের মনোবৃত্তি বর্জন করিয়া পুরুষের ন্যায় আচরণের অনুশীলনে উদ্যোগী হও। পর-শাসন স্বীকার করিয়া লওয়া অপেক্ষা মৃত্যু বরং শ্রেয়ঃ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেহে প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পর-হস্তক্ষেপ বা পর আক্রমণ হইতে আমাদের স্বদেশ-ভূমিকে মুক্ত রাখিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিব। আমরা আর দাস-জীবন বরদাস্ত করিব না। এই অবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়াও পাপ। যদি তোমরা শান্তি চাও, খোদাকে সন্তুষ্ট করতে চাও, তাহা হইলে উঠ, জাগ, আর না হয় চিরতরে অধঃপতনের অতলতলে তলাইয়া যাও।”

[ফ্রন্টিয়ার স্পীক্‌স্]

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

(ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব)

দ্বিতীয় মহাসমর বাধিবার পর মিত্র-শক্তিবর্গের পক্ষ হইতে যখন ঘোষণা করা হইল যে, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ করা হইতেছে, তখন সেই ঘোষণার সত্যতা যাচাই

করিবার জন্য জাতীয় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা দাবি করেন এবং ভারত সম্পর্কে ব্রিটেনের কি নীতি হইবে তাহা স্পষ্টভাবে জানাইতে অনুরোধ করেন।

পাকিস্তানের উদ্ভব

১৯৫২ সালের ২২শে মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতশাসন-মূলক কতকগুলি প্রস্তাব লইয়া নয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। ইহার কিছুকাল পূর্বে হায়দ্রাবাদের অধ্যাপক আবদুল লতিফ ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ভাগ করিয়া একটি ভাবী শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা করেন এবং মুসলমানপ্রধান অংশের পাকিস্তান নাম দেওয়ার প্রস্তাব করেন। মিঃ জিন্না অবিরত প্রচার করিতে থাকেন যে, বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ মুসলমান জনসাধারণের উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং এইজন্য ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া মুসলমানপ্রধান অংশকে সর্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দিতে হইবে। এই ব্যবস্থাটিকেই মোটামুটি তাঁহার অধীনস্থ লীগ পাকিস্তান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাকিস্তান কথাটির প্রবর্তক আবদুল লতিফ, কিন্তু পরে লীগমার্কা পাকিস্তানের ব্যাখ্যার ঘোরতর বিরোধিতা করিয়াছেন। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান, লীগ একমাত্র মুসলমান প্রতিষ্ঠান, আর পাকিস্তানের ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে হইবে, অগ্রে পাকিস্তান স্বীকার করিয়া না লইলে হিন্দুদের সহিত চরম আপসরফা হইতে পারে না—মিঃ জিন্না এই কথাই প্রচার করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ভারতের অখণ্ডত্বে বিশ্বাসী এবং ভারতের ভাগ্যকে

৪০ কোটি নরনারীর ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের সেরূপ একটি বিরাট অংশ এই পাকিস্তান প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। সীমান্ত-প্রদেশে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গাররা আজ পর্যন্ত পাকিস্তান পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। 'ইসলাম বিপন্নের' ধুয়া তুলিয়া ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করা হইলে যে বিষময় ফল দেখা দিবে, গফুর খান বহুবার বহু বক্তৃতা আলোচনা ও লেখার ভিতর দিয়া স্পষ্টভাষায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

পাকিস্তান সম্পর্কে গফুর খান

একবার লুই ফিসার মিঃ জিন্নার পাকিস্তান ও পাকিস্তান-পন্থীদের সম্পর্কে গফুর খানের মতামত জানিতে চাহিলে তিনি স্পষ্টভাষায় পাকিস্তানপন্থীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া বলেন, "ধনী খান-গণ, ঐশ্বর্যশালী নবাবের দল ও প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারাই পাকিস্তান সমর্থন করেন। যাঁহারা আমার দরিদ্র কৃষক জনসাধারণের উপর নির্যাতন করেন পাকিস্তান তাঁহাদেরই শক্তিবৃদ্ধি করিবে।" পাকিস্তান ইস্‌লামের শক্তি বৃদ্ধি করিবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে গফুর খান রাগিয়া বলেন, "জিন্না একজন নিকৃষ্ট মুসলমান। তিনি পয়গম্বরের প্রকৃত নিষ্ঠাবান অনুসরণকারী নহেন।"*

ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিবার চেষ্টা ও সামরিক নীতির পরিচালনায় ভারতের কর্তৃত্ব অস্বীকার করায় কংগ্রেস ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন

* হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ৭ই এপ্রিল ১৯৪৬, 'স্বাধীনতা ও ঐক্যবদ্ধ ভারত' লুই ফিসার।

না। মিঃ জিন্না ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাবে পাকিস্তান সম্পর্কে কোনরূপ নিষ্পত্তি না দেখিয়া ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। ভারতের কোন দল কর্তৃকই ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না।

"ভারত ত্যাগ কর"

ভারতের আসল দাবি ব্রিটেন তথা মিত্রশক্তিবর্গ এইভাবে এড়াইয়া চলে এবং তাহার ফলে সমগ্র ভারতে নৈরাশ্য ও বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে। এই সময় মহাত্মাজীর কণ্ঠে ভারতের মর্মবাণী ঘোষিত হয়। তিনি তাঁহার হরিজন পত্রিকায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ভারত ত্যাগ করিতে বলেন। মহাত্মাজীর সেই বাণী তখন সমগ্র ভারতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে বিখ্যাত "ভারত ত্যাগ কর" প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহাতে ভারতের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সামরিক শক্তির অপসারণ, সাময়িক গভর্নমেণ্ট গঠন, সম্মিলিত জাতিসমূহের সহিত পর-রাজ্য আক্রমণ প্রতিরোধের অভিপ্রায় এবং আবেদনের ব্যর্থতায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন আরম্ভের ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্ট মহাত্মা গান্ধী ও নেতৃস্থানীয় সমস্ত কংগ্রেস-কর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করিলেন। নেতৃবৃন্দের আকস্মিক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আসমুদ্রহিমাচল ভারতের জন-গণের মধ্যে এক নিদারুণ বিক্ষোভের সূচনা হইল। গভর্নমেণ্ট কঠোরহস্তে আন্দোলন-দমনে উদ্যোগী হইলেন। স্বাধীনতার যজ্ঞবেদীতে বহু নরনারী আত্মোৎসর্গ করিল। এই সংগ্রামে নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় নাই—এই আন্দোলন পরাধীন শৃঙ্খলিত জাতির মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

১৯৪২ সালের আগস্ট সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এখন পর্যন্ত রচিত হয় নাই। বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির রিপোর্ট ও নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও বক্তৃতার মারফত যখন যেটুকু জানা গিয়াছে সমস্ত একত্রিত করিলেও আন্দোলনের ব্যাপকতার তুলনায় তাহা নিতান্তই সামান্য হইবে। তাহা ছাড়া কংগ্রেস-কমিটিগুলির পক্ষ হইতেও এখন পর্যন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই। সীমান্ত-প্রদেশের ১৯৪২ সালের খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানা যায় নাই।

সীমান্তে আগস্ট আন্দোলন

আগস্ট আন্দোলনের প্রথম ভাগে সীমান্তের অধিবাসিগণ বাদশা খানের সুযোগ্য নেতৃত্ব পাইয়াছিল বলিয়াই আন্দোলন পরিচালনে সীমান্তের কংগ্রেস-কর্মিগণ প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ অহিংস ছিল। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে প্রথমতঃ পেশোয়ার জেলায় আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র প্রদেশে আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। প্রদেশের সর্বত্র বিপুলসংখ্যক সভা ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়া কংগ্রেস-কর্মিগণ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাবের আদর্শ প্রচার করিতে থাকেন এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে পাঠান জনসাধারণকে সমস্ত অহিংস শক্তি সংহত করিয়া চরম আত্মোৎসর্গের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতে আহ্বান জানান।

১৯৩০ সালের আন্দোলনের ন্যায় ১৯৪৩ সালেও আন্দোলন পরিচালনে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গাররা সম্পূর্ণ অহিংস থাকে। শত প্ররোচনামূলক অবস্থার মধ্যেও অহিংসার প্রতি তাহাদের

অবিচলিত নিষ্ঠার পরিচয় লাভ করিয়া সীমান্ত-কর্তৃপক্ষেরা খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারের আন্দোলন দমনে ২।১টি দৃষ্টান্ত ছাড়া কোন সময়েই বেপরোয়া হইয়া উঠিতে পারেন নাই। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মর্দান জেলায় আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠে। এই সময় ১১ই অক্টোবর পুলিসের গুলীতে ৩জন খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার নিহত হয় ও আরও কয়েকজন লোক আহত হয়। ইহা সত্ত্বেও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গাররা সম্পূর্ণরূপে অহিংস থাকে। গফুর খানের নিকট এই শোচনীয় ঘটনার সংবাদ পৌঁছিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মর্দান জেলায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু সীমান্ত-গভর্নমেণ্ট গফুর খানের মর্দান জেলা প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিলেন। বাদশা খান তাঁহার সংকল্পে অটল। তিনি সীমান্ত-কর্তৃপক্ষের সেই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মর্দান জেলায় প্রবেশ করিলেন। সীমান্ত-কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অভিযোগে গফুর খানকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হইল।

আগস্ট আন্দোলনের সময় যখন অন্যান্য প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি বে-আইনী ঘোষিত এবং ঐ সকল স্থানে সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছিল তখন একমাত্র সীমান্ত-প্রদেশেই কংগ্রেস নিয়মিত কাজ চালাইয়া যাইতেছিল; কারণ সে স্থানের অধিবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে অহিংস ছিল। অহিংস-নীতিতে অবিচলিত থাকিবার জন্যই সীমান্ত-কর্তৃপক্ষ তাহাদের কার্যাবলী নিষিদ্ধ করিতে পারেন নাই।

আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে গফুর খান

১৯৪৫ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় এক জনসভায় বক্তৃতাকালে খাঁ আবদুল গফুর খান ১৯৪২ সালে সীমান্ত-প্রদেশে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলন সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশ করেন তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অহিংসার প্রতি পাঠানদের অবিচলিত নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—১৯৪২ সালের আন্দোলনে ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশে হিংস-উপায়াদি অবলম্বিত হইয়াছিল, তখন একমাত্র সীমান্ত-প্রদেশই সম্পূর্ণরূপে অহিংস ছিল। সে সময় যখন অন্যান্য প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হয় এবং সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, তখন একমাত্র সীমান্ত-প্রদেশেই কংগ্রেস নিয়মিতভাবে কাজ করিয়া যাইতেছিল। কারণ সেখানে সকলেই সম্পূর্ণ অহিংস ছিল। তাহারা সকলে সেখানে অহিংস-নীতিতে এরূপ অবিচলিত ছিল যে, সীমান্তের তদানীন্তন গবর্নমেণ্ট তাহাদের কার্যাবলী নিষিদ্ধ করিতে পারেন নাই। গভর্নমেণ্ট অবশ্য যে কোন কারণেই হউক সীমান্ত-প্রদেশকে পাঞ্জাব হইতে বিভক্ত করিয়াছেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও গভর্নমেণ্ট সীমান্ত-প্রদেশের জনগণের অদম্য মুক্তি-স্পৃহা দমন করিতে পারেন নাই। কারণ তাহারা সকলেই অহিংস-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, 'অহিংস অস্ত্রটি' ভীরুদের জন্য নহে, বীরদের জন্যই, এবং সীমান্ত-প্রদেশের অধিবাসিগণ ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে যে,

তাহারা কৃতকার্যের সহিত গভর্নমেন্টের দমনমূলক কার্যাবলীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম।

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে মর্দান জেলায় প্রবেশ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অভিযোগে গফুর খান সীমান্ত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর বিভিন্ন কারাগারে বন্দী-জীবন অতিবাহিত করিবার পর ১৯৪৫ সালের ১৭ই মার্চ তিনি হরিপুরা জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন।*

গফুর খানের মুক্তি-প্রসঙ্গ

'কুখ্যাত' আওরঙ্গজেব মন্ত্রিসভা

* বহু কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর সীমান্ত-প্রদেশে বহুকাল পর্যন্ত অন্য কোন দলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু গফুর খানের গ্রেপ্তারের পর সীমান্ত-মন্ত্রিসভার প্রায় ১০ জন কংগ্রেসী সদস্যকে একে একে গ্রেপ্তারের ফলে পরিষদে মুসলীম লীগ দলের এক প্রকার কৃত্রিম সংখ্যাধিক্য হয়। সুযোগ বুঝিয়া সীমান্তের কংগ্রেস-প্রভাবকে বিলুপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে সীমান্ত-গভর্নর লীগ দলের নেতা সর্দার আওরঙ্গজেব খানকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বলেন। শীঘ্রই প্রতিক্রিয়াশীল লীগ দল এবং ব্রিটিশ সরকারের গোপন আলোচনা ফলপ্রসূ হইয়া উঠে এবং "কুখ্যাত" আওরঙ্গজেব মন্ত্রিসভা সীমান্তে কায়েম হয়। ব্রিটিশ সরকারের ক্রীড়নক রূপে এই মন্ত্রিসভা মাসের পর মাস সীমান্তে যে অনাচার চালাইয়াছিলেন এবং মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা করিয়া পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ এবং জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে এই মন্ত্রিসভার প্রতি সীমান্তবাসীদের ক্ষোভ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৪ সালের শেষভাগে সীমান্ত-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ একে একে মুক্তিলাভ করিলে ডাঃ খান সাহেব প্রকাশ্য জনসভায় এই প্রতিক্রিয়াশীল

গফুর খানের নূতন পরিকল্পনা

মুক্তিলাভের পর গফুর খান উটামানজাই-এ স্বগৃহে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কারাগারে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং দীর্ঘ কারানিপীড়নে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তথাপি জেল হইতে মুক্তিলাভের পরই কর্মের ডাকে তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। বেশীদিন চুপচাপ বসিয়া থাকাও তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। গফুর খান সীমান্তের সর্বত্র খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সংগঠন ও সংগ্রামের উপযোগী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একটি নূতন পরিকল্পনা গঠন করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি জুন মাসের প্রথমার্ধে সীমান্ত-প্রদেশের সমস্ত জেলা পরিদর্শনের উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ করেন দীর্ঘকারাবাসে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় চিকিৎসকগণ তাঁহাকে

মন্ত্রিসভাকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং সীমান্ত গভর্নরকে অবিলম্বে পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে বলেন। গভর্নর নানা অছিলায় ডাঃ খান সাহেবের এবং সীমান্ত-জনগণের এই আবেদন উপেক্ষা করিয়া লীগ মন্ত্রিসভাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কিছুকাল ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া অবশেষে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুআরি মাসে পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। এইভাবে আওরঙ্গজেব মন্ত্রিসভার বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজয় হয় এবং ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত-প্রদেশে পুনরায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করিবার সময়ই ডাঃ খান সাহেব জনসাধারণের নিকট ঘোষণা করেন যে, তিনি অবিলম্বে তাহাদের অবিসম্বাদী নেতা গফুর খানকে মুক্তি দিবেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গফুর খান মুক্তিলাভ করেন।

আরও কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু কর্মের আহ্বান উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। ডাক্তারের পরামর্শ ও আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের অনুরোধও তাঁহাকে গৃহে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না।

তাঁহার কর্মপ্রণালী

গফুর খান জুন মাসের মাঝামাঝি সফরে বাহির হন। চার্‌সাদ্দাতে সারধারী গ্রামে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের এক বিরাট সভায় গফুর খান তাঁহার গঠনমূলক পরিকল্পনা ও সফরের উদ্দেশ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি সীমান্তের সর্বত্র খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের গঠনমূলক কার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় কয়েকটি নির্দিষ্ট গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। পল্লীশিক্ষা-কেন্দ্রগুলির আবার একটি জেলা-সদর-কেন্দ্র থাকিবে এবং পল্লীকেন্দ্রগুলিকে এই সদর-কেন্দ্রের নির্দেশ ও পরামর্শ মানিয়া চলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বাদশা খান সারদোয়াবে প্রাদেশিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। পল্লীশিক্ষাকেন্দ্রে গঠন-মূলক কার্যাবলীর প্রাথমিক পদ্ধতিসমূহ আয়ত্ত করিবার পর চূড়ান্ত শিক্ষাগ্রহণের জন্য কর্মিগণকে প্রদেশিক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রাদেশিক শিক্ষাকেন্দ্রে ত্যাগ ও সেবাব্রতী নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে তাহাদের ত্যাগ, পরমত-সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, সেবা ও সর্বোপরি শৃঙ্খলারক্ষার অনুশীলনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হইবে।

পল্লী-অঞ্চল সফরে বাধা—গফুর খানের গ্রেপ্তার-প্রসঙ্গ

সীমান্তের পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার এই পরিকল্পনা জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি সফরে বাহির হন। বাদশা খান ঘরে ঘরে তাঁহার 'সেবার মহৎ বাণী' প্রচার করিতে থাকেন। কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিবার পর জুলাই মাসের শেষদিকে হাজরা জেলা যাইবার পথে আটক ব্রীজের নিকট পুলিস তাঁহাকে আটক করে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে আটক জেলায় প্রবেশ ও জনসভায় বক্তৃতা নিষিদ্ধ করিয়া আটকের ডেপুটি কমিশনার গফুর খানের উপর এক আদেশ জারী করেন। প্রস্তাবিত কর্মসূচী অনুযায়ী গফুর খানের পাঞ্জাবের আটক জেলার চাচা অঞ্চলে দুইদিন থাকিবার কথা ছিল। গফুর খান জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে এই মর্মে এক পত্র দেন যে, তাঁহার জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার কোন ইচ্ছা নাই। তবে হাজরা জেলা যাইবার পথে ঐ অঞ্চল দিয়া তিনি যাইতেছিলেন বলিয়াই তাঁহার পুরাতন বন্ধুদের সহিত কেবলমাত্র সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন।

চীফ্ পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী খান আমীর মহম্মদ খান ও সীমান্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি খান আলিগুল খানও গফুর খানের সহিত হাজরা জেলা অভিমুখে যাইতেছিলেন। আটক ব্রীজের নিকট পুলিস তাঁহাদের বাধা দিলে গফুর খান গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে পাঞ্জাব-এলাকায় প্রবেশ করেন। গফুর খান পুলিসকে বলেন যে, তাঁহাকে যখন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তখন তাঁহাকে হাজতে লইয়া

যাওয়া হউক। ইহাতে পুলিস তাঁহাকে জানায় যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তিনি এবোটাবাদে যাইতে পারেন অথবা পেশোয়ারে ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু গফুর খান পুলিসের কোন প্রস্তাবেই রাজী হন না।

গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ

বাদশা খানের গ্রেপ্তারের সংবাদে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে দলে দলে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আটক ব্রীজের অভিমুখে যাত্রা করে। কংগ্রেসের উদ্যোগে পেশোয়ারে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের এক সভায় গফুর খানকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাঞ্জাব সরকারের কার্যের তীব্র নিন্দা করা হয়। কি অবস্থায় গফুর খানকে গ্রেপ্তার করা হয়, খান আলিগুল খা সভায় তাহা বর্ণনা করেন। সভায় সমবেত জনমণ্ডলী দৃঢ়তার সহিত জানায় যে, সীমান্তের অধিবাসিগণ বাদশা খানের পশ্চাতে রহিয়াছে এবং বাদশা খানের জন্য তাহারা যে কোন সময়ে যে কোন প্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত আছে।

পরে পাঞ্জাব পুলিস গফুর খানকে ক্যাম্বেলপুরে লইয়া যায় এবং অতঃপর তাঁহাকে সীমান্ত-প্রদেশের কোহাট জেলার খুসাবগর নামক স্থানে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেয়। পাঞ্জাব সরকার নাকি গফুর খানের গ্রেপ্তারের সম্পর্কে কোন আদেশ জারী করেন নাই। এমন কি তাঁহার গ্রেপ্তার অথবা পরে তাঁহার মুক্তি সম্বন্ধে সরকারী সূত্রে কোন সংবাদ পাওয়ার কথাও পাঞ্জাব সরকার সরাসরি অস্বীকার করেন। ২৭শে জুলাই গফুর খান এবোটাবাদে পৌঁছেন।

লালা সাচারের প্রতিবাদ

গফুর খানের প্রতি সরকারের অযৌক্তিক মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিয়া পাঞ্জাব পরিষদের কংগ্রেসদলের নেতা লালা ভীমসেন সাচার এক বিবৃতির মারফত বলেন যে, স্বাধীনতার জন্য পাঞ্জাবের অগ্রগতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। লালা সাচার এই নিষেধাজ্ঞাকে মূর্খতা ও দূরদৃষ্টির অভাবের পরিচয় বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই আদেশের জন্য যদি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট দায়ী হন উহার দ্বারা জেলার কর্তৃত্ব গ্রহণের মত উচ্চপদের যোগ্যতা যে তাঁহার নাই তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। বাদশা খান শান্তি ও শুভেচ্ছারই অগ্রদূত। তাঁহার প্রতি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ক্ষমারও অযোগ্য। এই আদেশ দ্বারা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট গভর্নমেণ্টের প্রতিও অন্যায় করিয়াছেন। আর যদি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট গভর্নমেণ্টকে জানাইয়া এই কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ব্যাপারে গভর্নমেণ্টের নিন্দা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

পাঞ্জাব-পুলিসের আপত্তিকর ব্যবহার

গফুর খান সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে তাঁহার গ্রেপ্তার ও মুক্তির কাহিনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে আটকের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তজ্জন্য তিনি আটকের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দায়ী করিতেছেন। তিনি বলেন

যে, পাঞ্জাব সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তাঁহার উপর ম্যাজিস্ট্রেট যে নোটিশ জারী করিয়াছিলেন তাহার উত্তরেই তিনি ঐকথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছিলেন, তবে তাঁহার উপর যদি এরূপ কোন আদেশ জারী করা হয়, যাহার ফলে বন্ধুবান্ধবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে তিনি সে আদেশ পালন করিতে পারেন না, কারণ উহা দ্বারা শান্তিপূর্ণ নাগরিকের সাধারণ অধিকার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইবে। পাঞ্জাব-পুলিস তাঁহার প্রতি আপত্তিকর ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া গফুর খান অভিযোগ করেন।

কাশ্মীরে গফুর খান

৩রা আগস্ট গফুর খান শ্রীনগর গমন করেন। সেখানে পণ্ডিত জওহরলালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের মুক্তিলাভের পর গফুর খান ও পণ্ডিত নেহেরুর মধ্যে ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ। সীমান্তের তদানীন্তন পরিস্থিতি লইযা নেতৃদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেইদিনই কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের জন্য গফুর খান সোপুরে রওনা হইয়া যান।

বিশ্রাম গ্রহণ

এই সময় চিকিৎসকগণ গফুর খানের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দেন। ইহার পর গফুর খান রমজানের ৩০ দিন ভজ্জাগলির নির্জন পার্বত্য প্রদেশে উপবাস, প্রার্থনায় ও আত্মচরিত রচনায়

অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাহারও সহিত দেখা করিতেন না। প্রয়োজন হইলে তিনি পত্রের সাহায্যে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের পরামর্শ দিতেন।

বাঙ্গলাদেশে গফুর খান
ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কলিকাতা অধিবেশনে যোগদানের জন্য গফুর খান কলিকাতা আগমন করেন। তিনি ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতা পৌঁছেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকসমূহে যোগদানের পর ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা ত্যাগ করেন। ৭ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম আজাদের বাসভবনে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশন ৫ দিন ধরিয়া চলে। অধিবেশনকালে সর্বসমেত ৯টি বৈঠক হয়; তন্মধ্যে ৭টি আজাদ-ভবনে এবং ২টি সোদপুরে গান্ধীজীর কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। গফুর খান ২টি বৈঠক ছাড়া আর সমস্ত বৈঠকেই যোগদান করিয়াছিলেন। গফুর খান প্রায়ই সোদপুরে গান্ধীজীর সহিত সান্ধ্য-প্রার্থনায় যোগদান করিতেন। গান্ধীজীর পার্শ্বে উপবিষ্ট সীমান্ত-গান্ধীকে একজন অতিকায় মানব বলিয়া মনে হয়। দাঁড়াইলে মহাত্মা গান্ধী গফুর খানের স্কন্ধদেশ পর্যন্ত পৌঁছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের মিলন অন্তরে।

গফুর খান সভায় যাওয়া বা বক্তৃতা করা কোনটাই পছন্দ করেন না। তাঁহার বাণী কর্মের বাণী, সেবার বাণী। ১০ দিন

কলিকাতা থাকাকালীন গফুর খান মাত্র একটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত নেহেরুর সহিত আর একদিন ছাত্রদের বিশেষ অনুরোধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হলে একটি ছাত্রসভায় যোগদান করেন। ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় একটি জনসভায় বক্তৃতাকালে ইহার কারণ বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শহরের লোকেরা সাধারণতঃ রেডিও ও সংবাদ-পত্রাদির মারফত রাজনৈতিক মতবাদ ও ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ পায় এবং তাহাদের একটা-না-একটা রাজনৈতিক মতবাদে স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়া যায়। কিন্তু অজ্ঞ অগণিত পল্লী নরনারী এই সুযোগলাভ হইতে বঞ্চিত। বিশ্বের রাজনৈতিক মতবাদসমূহের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অত্যন্ত সরলপ্রকৃতির হইয়া থাকে। এইজন্যই তিনি সেই সরল গ্রামবাসীদের নিকট তাঁহার বক্তব্য বলা বেশী পছন্দ করেন।

বাঙ্গলার উদ্দেশ্যে গফুর খানের বাণী

বাঙ্গলা ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে বাঙ্গলার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট একটি বাণী চাহিলে গফুর খান বিনয়ের সহিত বলেন যে, তিনি তো একজন অসামান্য নেতা নহেন। তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষেরই একজন। তাঁহার কি বাণী দেওয়ার মত যোগ্যতা আছে? তাহা সত্ত্বেও বাঙ্গলা যদি তাঁহার নিকট বাণী চাহে তবে তিনি বাঙ্গলার অধিবাসিগণের জন্য 'সেবার বাণীই' রাখিয়া যাইবেন। অতঃপর গফুর খান বলেন—"আমি খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার। এই দেশের যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গ্রামের মানুষ আছে তাহাদের মধ্যে গিয়া কাজ করা, তাহাদের সেবা করাতেই আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি দরিদ্র, পদদলিত দুর্বল ও

অস্পৃশ্যদের সেবা করিতে, মানুষের সেবা করিতেই আমি খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের শিখাইয়াছি। এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সেবার মধ্যেই আমি স্বাধীনতার আলোকরশ্মি দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গলার অধিবাসিগণের নিকটে আমার সেবার বাণীই আমি রাখিয়া যাইতেছি। যদি বাঙ্গলাদেশ আমার নিকট হইতে বাণী চাহে, তবে তাহাকে এই বাণী দিয়া যাইতেছি, —আমার দরিদ্রসেবার ব্রতই সে গ্রহণ করুক এবং গ্রামে গ্রামে গিয়া প্রয়োজনীয় কার্যাদি সাধন করুক।"......

"আমরা ব্রিটিশদের অপেক্ষা উন্নততর না হইতে পারিলে স্বাধীনতালাভ করিতে পারিব না। যতদিন তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া থাকিব ততদিন আমাদের পক্ষে স্বাধীনতার দাবি করা উচিত নহে। ব্রিটিশদের অপেক্ষা আমাদের উন্নত হইতে হইলে চরিত্রের দিক দিয়া আমাদের খাঁটি হইতে হইবে। কেবলমাত্র প্রার্থনায় যোগদান অথবা নেতৃবৃন্দের সম্মুখে মাথা নত করিলেই আমাদের প্রকৃত চরিত্রলাভ হইবে না। এই চরিত্রলাভ কাহাকেও শিখান যায় না। মানুষের কাজের মধ্য দিয়াই তাহার প্রকাশ। আমাদের স্বার্থান্বেষণ, অর্থলোভ, নিজ সহোদরদের সহিত বিরোধ জগতের নিকট আমাদের হেয় করিয়া তুলিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক বিরোধে দুঃখপ্রকাশ করিয়া গফুর খান বলেন, "একই মাটিতে লালিত-পালিত দুই সন্তান হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করিতেছে। পৃথিবীর আর কোথাও কি আপনারা শুনিয়াছেন, 'হিন্দু জল,' 'মুসলমান জল' বলিয়া লোকে চেঁচাইতেছে। যতদিন পর্যন্ত না এই বালাই শেষ হয়, ততদিন আমরা 'মানুষ' নামেরও অযোগ্য।

"একবার একজন ব্রিটিশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। কোনদিনই সে কর্তব্য হইতে বিচলিত হইবে না। অর্থলোভ তাহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে না ; মৃত্যুতেও সে পরাজয় স্বীকার করে না। পরমাণু বোমার মত ভয়ঙ্কর বস্তুও তাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু ভারতের এমন অনেকের দেখা মিলিবে যাহারা পরস্পরকে বঞ্চনা করিতেছে। আমাদের বহুলোকের মধ্যে অকপটতা নাই।

"কংগ্রেস এতদিন ধরিয়া উদ্দেশ্যলাভ ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। জাতির মুক্তির জন্য গান্ধীজী তাঁহার যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সকলের মধ্যে প্রকৃত ও অকপট ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে কিছুই লাভ হইবে না।

"আমি গ্রামে গ্রামে গিয়া গ্রামের মানুষের মধ্যে কাজ করিতে ভালবাসি। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্যই আমি বাঙ্গলায় আসিয়াছি। বাঙ্গলার গ্রামগুলিতে যাইতে পারিতেছি না। আমার এই গ্রামগুলিতে ঘুরিবার বড় ইচ্ছা, কিন্তু হাতে সময় নাই।"

সীমান্ত-প্রাদেশিক নির্বাচন

গফুর খান ১৯৪৬ সালের জানুআরি মাসে বাঙ্গলাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর প্রাদেশিক নির্বাচন-সংক্রান্ত কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সীমান্ত প্রদেশে নির্বাচনে সরকারী কর্মচারিগণ ও লীগ-সমর্থকেরা প্রকাশ্যে যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন, গফুর খান সর্বত্র তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফেব্রুআরি মাসের প্রথম দিকে গফুর খান নির্বাচনী প্রচার-

কার্যের জন্য প্রদেশ-সফরে বাহির হন এবং প্রদেশ পরিভ্রমণ-কালে মুসলীম লীগ ও সরকারপক্ষের দুর্নীতি ও অপকৌশল সম্পর্কে জনসাধারণকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে বলেন।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারগণ যাহাতে নির্বাচনে জয়লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য সরকারপক্ষ সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হয়। গফুর খান প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস-বিরোধী প্রচার-কার্যের দ্বারা কংগ্রেসকে দুর্বল করাই সরকারপক্ষের উদ্দেশ্য কিন্তু পরবর্তী কতকগুলি ঘটনা হইতে তাহার মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে যে, খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তলে তলে একটা উদ্দেশ্যমূলক ও সুসংবদ্ধ ষড়যন্ত্র চালান হইয়াছে। গফুর খান ২৫শে ফেব্রুআরি সীমান্ত-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদের এক সভায় স্পষ্ট ভাষায় ইহা ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। গফুর খান সরকারপক্ষের এই ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "প্রদেশ-সফর শেষ করিয়া ফিরিবার পর সরকারী শাসনযন্ত্র কিভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কাজ চালাইয়া যাইতেছে সে সম্পর্কে আমি মন্ত্রিমণ্ডলীকে জানাইয়াছিলাম। গোড়ার দিকে আমার মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, ইহা হয়ত কেবলমাত্র কংগ্রেস-বিরোধী প্রচারকার্য; কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহ হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের বিরুদ্ধে একটা সুসংবদ্ধ ষড়যন্ত্র চালান হইয়াছে।"

নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল, সরকারপক্ষের সমস্ত অপকৌশল সত্ত্বেও সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছে। সীমান্ত-

পরিষদে মোট ৫০টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসনেই কংগ্রেস-প্রার্থিগণ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। মুসলীম লীগ প্রার্থীরা মাত্র ১৭টি আসন পায়। অন্যান্য দলের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমান ২টি ও অকালীদল ১টি আসন লাভ করে।

নির্বাচনের পর যখন দেখা গেল সীমান্ত-ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে তখন সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে পরামর্শের জন্য কংগ্রেসের তরফ হইতে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সীমান্ত-প্রদেশে গমন করেন। ফেব্রুআরি মাসের শেষ সপ্তাহে মৌলানা আজাদ পেশোয়ারে পৌঁছেন। সেখানে খাঁ আবদুল গফুর খান ও ডাঃ খান সাহেবের সহিত সুদীর্ঘ আলোচনার পর তিনি সীমান্তে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনে পরামর্শ দেন। সীমান্ত-প্রদেশে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই মৌলানা আজাদ সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসী নেতৃগণকে মন্ত্রিসভা গঠনে পরামর্শ দেন। অতঃপর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

১৯৪২ সালে স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ভারত-শাসনমূলক প্রস্তাব লইয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার ঠিক ৪ বৎসর পর ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অনুমোদনক্রমে এবং পার্লামেণ্টের অনুরোধে ভারতের সহিত একটা বোঝাপড়া ও ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের অভিপ্রায় লইয়া ১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ করাচীতে পদার্পণ করেন। ক্রিপ্‌স্ সাহেবও গতবার ১৯৪২ সালের ঠিক ২৩শে মার্চেই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

মন্ত্রিমিশন ভারতে আসিয়াই কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দকে আলাপ-আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করেন। দিল্লীতে নেতৃবৃন্দ ও মন্ত্রিমিশনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকে। লীগ-দলপতি মিঃ জিন্নার একগুঁয়েমির জন্য আপস-আলোচনা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না। তিনি পাকিস্তানের দাবি ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন না। একটি-মাত্র যুক্তরাষ্ট্র বা একটিমাত্র শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাবে মিঃ জিন্না কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। তিনি ভারতবর্ষকে সার্বভৌম দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিবার দাবি জানাইলেন—একটি হিন্দুস্থান এবং অপরটি পাকিস্তান। অপর পক্ষে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা, অখণ্ড ভারত ও স্বয়ং-শাসিত প্রদেশগুলির সমবায়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দাবি জানান।

অতঃপর মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে আপস-আলোচনা চালাইবার জন্য ৬ই মে সিমলায় ত্রিদলীয় বৈঠক আরম্ভ হইল। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ, খাঁ আবদুল গফুর খান, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সর্দার প্যাটেল ও মুসলীম লীগের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে সমসংখ্যক প্রতিনিধি ও মন্ত্রীমিশনের মধ্যে যুক্ত বৈঠক বসে। কিন্তু সপ্তাহকাল অধিবেশনের পর সিমলা-সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। লীগ সমস্ত ব্যাপারটি মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক সালিসের প্রস্তাবেও রাজী হন না।

সিমলা-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার ৪ দিন পর ১৬ই মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যুগপৎ বিলাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটিলী ও ভারতে বড়লাট ও মন্ত্রীমিশন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ৬টি মূল প্রস্তাব সহ এক নয়া পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।

দেশী ও বিদেশী প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্যে ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মন্ত্রীমিশনের সুপারিশ বর্তমান অবস্থায় এক-কথায় "গ্রহণযোগ্য" বলিয়া মত প্রকাশ করে। মহাত্মা গান্ধীও তাঁহার হরিজন পত্রিকায় মন্ত্রীমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে বলিলেন, "বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর কোন দলিল রচনা করিতে পারিতেন না।" অবশ্য পরে তিনি এই দলিলে যে গুরুতর দোষক্রটি আছে তৎপ্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

মন্ত্রীমিশনের সুপারিশ যেভাবে গ্রুপ (মণ্ডল) ভাগের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে কংগ্রেসমহলে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। সীমান্ত-প্রদেশ ও আসামকে যেভাবে এক-একটি মণ্ডলে জুড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে সেরূপ করা হইলে এই দুইটি প্রদেশের প্রতি ঘোরতর অন্যায় করা হইবে। আসামের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বরদুলুই ও সীমান্ত-প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব ও গফুর খান এই বাধ্যতামূলক মণ্ডলভাগের তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু কোন্ প্রদেশ কোন্ মণ্ডলে যোগ দিতে চাহে কি না চাহে তাহা না দেখিয়া কতকগুলি প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগ দেওয়ার জন্য বাধ্য করিতে মুসলীম লীগ পীড়াপীড়ি করিতে থাকে।

খাঁ আবদুল গফুর খান ২২শে মে নয়া দিল্লী হইতে এ সম্পর্কে লীগের মনোভাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে বলেন, "মুসলীম লীগ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের উপর জোর দিয়াছিলেন, কংগ্রেসকে দিয়া উহা স্বীকার করাইয়া লইতে বহুলোক আমার উপর চাপ দিয়াছিলেন। কংগ্রেস

পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং এমন কি আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্ত দাবিই স্বীকার করিয়াছে। এক্ষণে কোন্ প্রদেশ কোন্ মণ্ডলে যোগ দিতে চাহে কি না চাহে, তাহা না দেখিয়াই কতকগুলি প্রদেশকে প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগ দেওয়ার জন্য বাধ্য করিতে মুসলীম লীগ জিদ ধরিয়াছে। ইহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিকে অস্বীকার করা হইতেছে। প্রদেশসমূহ অবশ্যই পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবে, কিন্তু প্রদেশসমূহকে স্বাধীনভাবে ও শুভেচ্ছার মনোভাব লইয়াই তাহা করিতে হইবে।"

ভারতের স্বাধীনতা ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য হিন্দু-মুসলীম সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "আমি একজন খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার। মানবতার সেবাকেই আমি খোদার সেবা বলিয়া মনে করি। আমি ইসলামের কাছ হইতে সকল মানবের সেবা করিবার শিক্ষাই পাইয়াছি। স্বাধীনতার অভাবে ধর্ম কিংবা অন্য কল্যাণকর কিছুই করা যায় না। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা আমার পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং ইহার অর্থ—এই মহান্ দেশে যাহারা বাস করে তাহাদের প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ও আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করা। আমার মনে হয় সকল সম্প্রদায়ের প্রীতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই ভারতের স্বাধীনতা বিকাশ লাভ করিতে পারে। আমি এই উদ্দেশ্য লইয়াই কাজ করিতেছি এবং এইভাবে কাজ করিয়া যাইব। ঘৃণা ও বিদ্বেষের পথে ভারত অথবা ভারতের কোন সম্প্রদায় বিকাশ লাভ করিতে পারিবে না। আমাদের সকলকে একসঙ্গে বাস করিতে হইবে এবং একসঙ্গে চলিতে হইবে।"

মুসলমান-সমাজের নিকট তাহাদের মহান্ ধর্মের নির্দেশ

মানিয়া চলিবার জন্য আবেদন জানাইয়া বাদশা খান আরও বলেন, "আমি আশা করি, সময় আসিতেছে যখন আমরা সকলেই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির উর্ধ্বে উঠিয়া সমগ্রভাবে স্বাধীনতার চিত্রপটে দৃষ্টিপাত করিব। আমরা ব্যর্থ সংঘর্ষে প্রচুর সময় ও সামর্থ্য ব্যয় করিয়াছি। ইহাতে আমাদের শত্রুই লাভবান হইয়াছে। মুসলমানদের কাছে আমার একটা বিশেষ অনুবোধ আছে। আমি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মহান্ ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে অনুরোধ করিতেছি এবং এই দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতা ও বিকাশ লাভের জন্য অপরাপর সকলের নেতৃত্ব আহ্বান করিতেছি।"

মে মাসের শেষ সপ্তাহে গফুর খাঁন পেশোয়ার প্রত্যাবর্তন করেন। ২৭শে মে কোহাটে সীমান্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের এক সভায় গফুর খান দিল্লীর শাসনতান্ত্রিক আলোচনা ও মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেন। এই সম্মেলনে মন্ত্রীমিশনের সুপারিশে প্রদেশসমূহকে প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগদানে বাধ্য করা হইয়াছে বলিয়া উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

জুন মাসের প্রথমে গফুর খান মন্ত্রীমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে জনমত জানিবার জন্য প্রদেশ-সফরে বাহির হন। সফরের সময় খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সহিত আলাপ-আলোচনায় গফুর খান দেখেন যে, সকলেই বাধ্যতামূলক প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগদানের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে। গফুর খান সফর হইতে ফিরিবার পর সংবাদপত্রে এক বিবৃতি

মারফত তাঁহার সফরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন যে, সীমান্ত-প্রদেশে পুশতো ভাষাভাষী সমস্ত লোকই বাধ্যতামূলক প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগদানের বিরুদ্ধে। সীমান্তের পাঠানগণ স্বভাবতই স্বাধীনতাপ্রিয় এবং তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে এরূপ কোন প্রস্তাবেই পাঠানগণ কখনও সম্মতি দিতে পারে না।